(প্রাচীন ভারতে)

হিন্দুদের রাজ্যশাসন-প্রণালী

শ্রীশিশিরকুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ

প্রণীত

১ম সংস্করণ

১৩৪৪ সন

[মূল্য দশ আনা মাত্র]

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

দি স্কুল সাপ্লাই কোং
পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

ইণ্ডিয়ান বুক সোসাইটি
৫নং পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

আলবার্ট লাইব্রেরী
নবাবপুর, ঢাকা।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা ও কলিকাতার সকল পুস্তকালয়।

প্রিণ্টার—শ্রীব্রজবল্লভ বসাক
বাণী প্রেস, ৭২নং নবাবপুর, ঢাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার মহোদয় বলেন—

" * I have glanced through your book and find it interesting. * Wishing you every success.

(Sd.) Syama Prasad Mookerjee."

নিবেদন

উক্ত পুস্তকখানি লিখিতে Pramatha Nath Banerjee কৃত—Public Administration in Ancient India, R. Shama Sastry র—Kautilya's Arthasastra, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার কৃত—চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ, রমেশচন্দ্র দত্তের—ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—International Law and Custom in Ancient India প্রভৃতি হইতে সাহায্য লইয়াছি. তজ্জন্য উপরি উল্লিখিত গ্রন্থকারগণের নিকট চিরন্তন ঋণ স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ, পি এইচ-ডি মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবিত ও অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ গোস্বামী, বিদ্যারত্ন এম-এ মহোদয় কিছুদিন পূর্ব্বে পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন এইরূপ আশ্বাস দিয়া তদনুসারে লেখার সাথে সাথে উহা দেখিয়া যাওয়ায়, দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া আমাকে পুস্তকখানি সত্বর সমাপ্ত করিতে হইল এবং অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, শাস্ত্রী, এম-এ, কাব্যতীর্থ উক্ত পুস্তকখানি লিখিতে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন ও ইহা দেখিয়া দিয়াছেন ; তজ্জন্য উপরি উক্ত অধ্যাপকদ্বয়ের নিকট আমি চিরদিন

কৃতজ্ঞ। এতদ্ব্যতীত ঢাকা জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত রায় সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র বাহাদুর, পণ্ডিত শ্রীরাধাবিনোদ মুচ্ছদি জ্যোতিষার্ণব ও অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পুস্তকখানিতে কোন দোষ ত্রুটি থাকিয়া থাকিলে, সে দোষ আমার এবং উহার গুণবত্তার জন্য প্রশংসার পাত্র ভারতের পুরাবৃত্ত লেখকবর্গ সকলেই।

এক্ষণে পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইলে সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

শুভ বিজয়া দশমী
১৩৪৪ সন।
২৩৭, নবাবপুর রোড,
ঢাকা।

বিনীত—
শ্রীশিশিরকুমার বসাক

ভূমিকা

শ্রীমান্ শিশিরকুমার বসাক সাহিত্যভূষণ প্রণীত "প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের রাজ্যশাসন-প্রণালী" নামক নাতিদীর্ঘ পুস্তকখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। শ্রীমান্ মাঝে মাঝে মাসিক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ ছাপিয়া প্রকাশ করিত, ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু, পূর্ব্বে মনে করিতে পারি নাই যে, এত অল্প বয়সেই শিশিরকুমার এতটা যত্ন সহকারে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন ভারতের রাজ্যশাসন প্রণালী বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়া আমাদিগকে দেখাইতে সমর্থ হইবে। শিশির বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই, তথাপি তাহার যেরূপ বিদ্যোপার্জ্জনে অভিনিবেশ, তাহাতে যে সে এমন একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিতে পারিবে ইহা একবারে বিস্ময়ের কারণ হইতে পারে না।

এই পুস্তকে শিশির যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে, তাহা সাধারণ পাঠকশ্রেণী সরল বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাঠ করিবার বড় একটা সুযোগ পান না, কারণ এই প্রকার বিষয়ে লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক বড় কমই দৃষ্ট হয়। কতকগুলি অধ্যায় এই পুস্তকে বেশ সুন্দরভাবে

লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজ্যশাসন প্রণালীর বিভিন্ন বিষয় বিভাগের ধারণা করিতে হইলে, এই পুস্তকখানি পাঠক মাত্রেরই সহায়তা করিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। আশা করি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমান্ এই প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের জ্ঞান আরও বাড়াইয়া লইয়া পরে আরও অধিকতর মূল্যবান্ পুস্তক রচনায় সমর্থ হইবে। বাঙ্গালী পাঠকেরা তাহার এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তদীয় উৎসাহ বর্দ্ধন করুন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক
অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ,
কলিকাতা।

২৭শে আশ্বিন,
১৩৪৪ সন।

সূচীপত্র

প্রাচীন ভারতে
হিন্দুদের রাজ্যশাসন-প্রণালী

[সংক্ষিপ্ত ইতিহাস]

আর্য্যদের সামাজিক জীবন ও সভ্যতা।

আর্য্যদের আদি বাসস্থান পারস্য দেশ, মধ্য এসিয়া অথবা আরও উত্তরে যে কোথায় ছিল এবং কখনই বা তাহারা উহা ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িল তাহা সঠিক বলা যায় না। যাহা হউক, পঞ্চনদের তীরে আসিয়া যখন তাহারা বাস করিতে আরম্ভ করিল তখন হইতে তাহাদের সভ্যতার আভাষ আমরা পাইয়া থাকি।

তখনকার আর্য্যেরা কয়েকটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। তাহারা আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তাহারা সকলে যে একই বংশ হইতে জাত সে বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। সময়ে সময়ে হিংসাপরবশ হইয়া তাহারা ঝগড়া বিবাদ করিত সত্য, কিন্তু এরূপ দৃশ্য কদাচিৎ তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইত।

বৈদিক যুগের প্রারম্ভে সমাজের আকৃতি অত্যন্ত সামান্য ছিল। তখন কোন জাতিভেদ ছিল না। সকলেই সমান। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, অনার্য্যদের সহিত আর্য্যদের বিরোধ ততই বাড়িতে লাগিল। তখন অনার্য্যদের হইতে আর্য্যেরা নিজেদের পৃথক্ রাখিবার আবশ্যকতা অনুভব করিল এবং নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি-বিষয়ে যত্নপর হইল। তখন হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায়। সম্ভবতঃ প্রথমে বর্ণ দ্বারাই জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ আর্য্যদের গায়ের রং পরিষ্কার এবং ভারতীয় অনার্য্যদের গায়ের রং কাল ছিল। ভারতীয় অনার্য্যদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন বৃত্তান্ত আমরা অবগত নই। তবে এইরূপ জানা যায় যে তাহারা বহু পূর্ব্বে ভারতে আগত কোলারিয়ন্ ও দ্রাভিড়িয়ান্ এই দুই জাতির বংশধর। তাহাদের মধ্যে আবার কতক ছিল সভ্য এবং কতক অসভ্য। বিজয়ী আর্য্যেরা তাহাদের সভ্যতার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অনার্য্যদের আচার ব্যবহারগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং আর্য্যরক্ত পবিত্র রাখিবা উদ্দেশ্যে অনার্য্যদের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল।

এইরূপে সভ্যতা বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তা নানাপথে ধাবিত হইল এবং ইহা হইতেই মানুষের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগের সৃষ্টি হইল। এইরূপে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ, দেশ রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়, ব্যবসায়

বাণিজ্যের জন্য বৈশ্য বর্ণের সৃষ্টি হইল। অনার্য্যদের মধ্যে যাহারা আর্য্যদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল।

বৈদিক যুগের প্রারম্ভে জাতিভেদ প্রথাতে বর্ত্তমানের ন্যায় কঠোরতা ছিল না। তখন আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। কখন কখনও মুনিঋষিরা রাজার কন্যা বিবাহ করিতেন। তখন জন্মগত বংশের মর্য্যাদা হইতে চরিত্র ও কর্ম্মের স্থান অনেক উচ্চে ছিল। ব্রাহ্মণ্য যুগে জাতিভেদ প্রথা কঠোর হইতে কঠোরতর হইল। মেগাস্থেনিসের মতে দেখা যায় যে খৃষ্ট জন্মের চারি শতাব্দী পূর্ব্বে নিজের জাতির বাহিরে কেহ বিবাহ করিতে পারিত না। নিজ নিজ জাতিগত ব্যবসায় ছাড়িয়া কেহ অন্য কাজ করিতে পারিত না, অথবা একটির বেশী দুইটি কাজ করিতে পারিত না। অতঃপর উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে।

জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ব্রাহ্মণেরা যে কেবল ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ হইল তাহা নহে, শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতি ও শাসনে তাহারা অন্যান্য জাতির হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইয়া

উপরি উল্লিখিত কর্ত্তৃত্বটুকু লাভ করিতে ব্রাহ্মণদের অনেক লড়িতে হইয়াছিল। পরশুরামের পৃথিবীকে একুশ বার ক্ষত্রিয়-শূন্য করিবার বিবরণ হইতেই তাহা যথার্থ প্রমাণিত হয়। বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয়বংশসমুদ্ভব বর্দ্ধমান, মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু রাজ-নীতির দিক দিয়া ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয় নাই।

তখন জাতিভেদ থাকিলেও প্রত্যেকটি মানুষের জীবন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইত।

প্রাচীন ভারতে একান্নভুক্ত পরিবার ছিল। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতিকে লইয়াই উহা গঠিত হইত। একে অন্যের পরিশ্রমের ফল সমানভাবে ভোগ করা, আপদে বিপদে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা এবং সকলে একত্রে মিলিয়া পারিবারিক সম্পত্তি, আয় ও উন্নতি বৃদ্ধি করাই তখনকার যৌথ পরিবারের বিশেষত্ব ছিল। পিতাই পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। অধীন লোকেরা কর্ম্মের জন্য যেমন তাঁহার কাছে ঋণী, তিনিও তেমনি আবার স্বীয় কর্ত্তব্যের জন্য দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তাই বলিয়া পিতা পরিবারের সকল সম্পত্তির মালিক নহেন, পরিবার সুচারুরূপে চালনা করিবার তিনি প্রতিনিধিমাত্র ছিলেন। এইরূপে দেখা যায় যৌথ পরিবারেও তাঁহার ক্ষমতার একটা সীমা ছিল।

তখনকার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আন্তরিক সৌহার্দ্দ পরিলক্ষিত হইত। মনু প্রভৃতির সময়ে গ্রামগুলি সামাজিক

জীবনের পবিত্র আদর্শ ছিল। "ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার একটা বিশিষ্টতা ছিল। তাহার লক্ষ্য ছিল—ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিকাশ করিয়া তোলা। আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এমন কি আমাদের রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। তাই মন্বাদি যে সকল সংহিতামূলে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইত তাহাদিগের নাম ছিল 'ধর্ম্মশাস্ত্র'।" বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি, মীমাংসা প্রভৃতি হইতে আইনের উৎপত্তি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন। তখনকার লোকেরা আইনকে ধর্ম্ম বলিয়া মানিত এবং বিচারালয়কে ধর্ম্মাধিকরণ বলিত।

রাজ্য শাসনের বিভিন্ন ধারা

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য যুগে সমগ্র দেশটা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঐ দেশসমূহে প্রচলিত শাসনপদ্ধতিও বিভিন্ন রকমের ছিল। উহার কোন কোন রাজ্য রাজার দ্বারা শাসিত হইত, আবার কোন কোন স্থানে প্রজাতন্ত্র বা সাধারণ-তন্ত্র প্রচলিত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে এইরূপ উল্লেখ আছে যে প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র বা একাধিপত্য সাম্রাজ্য একচেটিয়া ছিল না। মহাভারতেও রাজা ছাড়া 'ষ্টেটে'র উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃষ্ণিরা রাজ্যের প্রধানদের হস্তে লোকশাসনের ভার অর্পণ করিয়াছিল এবং কৃষ্ণও ঐ সমস্ত প্রধানদের মধ্যে একজন ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থানের সময়ে ভারতে বহুসংখ্যক স্বাধীন জাতি ছিল। তাঁহারা উপরি উক্ত দুইটি শাসন পদ্ধতির যে কোন একটির অধীনে ছিল। সাধারণ তন্ত্রে 'ষ্টেটে'র কার্য্যাবলী জাতীয় সভায় আলোচিত ও স্থিরীকৃত হইত এবং কর্ম্মসম্পাদনের ক্ষমতা দলপতি বা মুখ্যদের হস্তে ছিল। তাহারাই যুদ্ধে সেনাপতির কাজ করিত। চাণক্য হইতে আমরা আরও জানিতে পাই যে প্রাচীন ভারতে লিচ্ছবি, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি গণের হস্তে লোকশাসনভার ছিল। এইগুলি গণতন্ত্র-শাসিত রাজ্য।

আর্য্যেরা যতই পঞ্জাব হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, রাজ্য তাহাদের ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন

তাহাদের বিশাল রাজ্য শাসন করা কষ্টকর হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও প্রতিনিধি পাঠাইয়া শাসন করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। আলেক্‌জেণ্ডারের সহজে ভারত জয়ের মূল কারণ যখন তাহারা খুঁজিয়া পাইল (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য থাকায় আক্রমণকারীর পক্ষে ভারত জয় অতি সহজেই হইয়াছিল ; কারণ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিল ছিল না) তখন তাহারা রাজকীয় শাসনের প্রবর্ত্তন করিবার জন্য চন্দ্রগুপ্তকে আহ্বান করিল। চন্দ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলি জয় করিলেন এবং উহা মগধের সহিত সংযুক্ত করিয়া তথায় রাজকীয় শাসন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিলেন। তাই বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত যে আদি রাজা বা সম্রাট্ তাহা নয়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বের লোকেরাও 'চক্রবর্ত্তী' কথাটার সঙ্গে পরিচিত ছিল এইরূপ জানা যায়। পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে 'আদিরাজ', 'সম্রাট্', 'সার্ব্বভৌম' প্রভৃতি কথার অসংখ্য উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং শতপথ ব্রাহ্মণে সার্ব্বভৌম রাজাদের উৎসব আনন্দের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই যে জরাসন্ধ সার্ব্বভৌম রাজা হইবার আশা পোষণ করিতেন। পাণ্ডবদের দ্বারা তাঁহার পরাজয়, যুধিষ্ঠিরের দিগ্বিজয় এবং রাজকীয় উপাধি ধারণের কথা শুনিতে পাই। তখনকার ক্ষমতাশালী সম্রাটেরা রাজ্যবিস্তৃতির উপর যতটা জোর দিতেন, রাজ্যশাসনের উপর ততটা দিতেন না। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবিস্তৃতির জন্য

তাঁহারা পরস্পর সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। অজাতশত্রু ও মহাপদ্মনন্দ দেশের বিশাল স্থানসমূহ তাহাদের শাসনাধীনে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তই সর্ব্বপ্রথম আফগানিস্থান হইতে বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য নিজ একচ্ছত্রাধিপত্য শাসনাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ার সহস্র বৎসর পরেও, ভারতবর্ষ রাজকীয় শাসনের উপকারিতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যশাসনবিধি প্রবর্ত্তন করিলেন। রাজা অশোকের সময় উহা আরও উন্নত হয়। তখন হইতে রাজ্যের দূরবর্ত্তী প্রদেশগুলি রাজপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত দেশগুলির সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের চিঠিপত্র চলিত। রাজ্যের চলতি ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত থাকিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বহু লোক নিযুক্ত ছিল। বিজিত রাজ্যের শাসনভার তথাকার রাজার উপর ন্যস্ত ছিল। এই বিষয়ে তাঁহাদের অনেকটা স্বাধীন ক্ষমতা ছিল। ইহা ছাড়া আরও এক প্রকারের রাজা ছিলেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে সমস্ত বিষয়ে স্বাধীন থাকিলেও কেন্দ্রীয় সরকারকে বার্ষিক কর দিতেন এবং বিদেশীদের সহিত যুদ্ধে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। তখনকার শাসন পদ্ধতিকে অনেকটা 'লিমিটেড মনার্কি' বলা যাইতে পারে। সম্রাটের ক্ষমতার উপরও নানারকম আইন কানুন ছিল। তাহাকেও শাস্ত্রের অথবা দেশের প্রচলিত

নিয়মবিধি মানিয়া চলিতে হইত। কর্ম্মক্ষেত্রে রাজা মন্ত্রীদের দ্বারা চালিত হইতেন, কারণ তাঁহারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। তখন তথায় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা জনসাধারণের নিকট সমাজের প্রকৃত অভিভাবকরূপে গণ্য হইতেন।

রাজনৈতিক বিভাগ

বহু প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টের জন্মের চারি শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বৈদিক যুগে পঞ্জাবে এক বিশাল জাতি বাস করিত, তন্মধ্যে পুরু, যদু প্রভৃতি বিখ্যাত। ব্রাহ্মণ্যযুগে কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি জাতি উল্লেখ যোগ্য। কুরু ও পাঞ্চালদের মধ্যে এইরূপ ভাব ছিল যে তাহারা বাস্তব ক্ষেত্রে এক জাতি বলিয়া মনে হইত। কোশল, কাশী, বিদেহ জাতির মধ্যেও সেইরূপ ভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু শেষোক্ত জাতির সহিত পূর্ব্বোক্ত জাতির বড় বেশী মিল ছিল না। কুরুপাঞ্চালেরা মধ্যদেশ এবং অপর তিন জাতি পূর্ব্বদেশ অধিকার করিয়াছিল।

খৃষ্ট জন্মের ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্ব্বে 'পালিপিটকে' যে **ষোলটি মহাজনপদের** উল্লেখ আছে তাহা এই :—

(১) অঙ্গ, বর্ত্তমান ভাগলপুরের কাছে। উহার রাজধানী ছিল চম্পা নগরী।

(২) মগধ অথবা দক্ষিণ বিহার, উহার রাজধানী প্রথমে রাজগৃহে ও পরে পাটলীপুত্রে হইয়াছিল।

(৩) কাশী, বর্ত্তমান বারাণসী। রাজধানী কাশীই ছিল।

(৪) কোশল, নেপালের সীমানায় স্থিত, শ্রাবস্তী তাহার রাজধানী

(৫) বাজীয়ানদের দেশ ব্রিজি। আট্‌টি জাতির মিলিত-শক্তি ছিল এই বাজীয়ানেরা। তন্মধ্যে লিচ্ছবি ও বিদেহগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল। বিদেহদের রাজধানী ছিল মিথিলা এবং বৈশালী লিচ্ছবিদের রাজধানী ছিল।

(৬) মাল্লাদের দেশ, তাহারা দুইটি স্বাধীন জাতিতে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের রাজ্য শাকাভূমির পূর্ব্বে পর্ব্বতের ঢালু জায়গার উপরে অবস্থিত ছিল।

(৭) চেদিদের দেশ চেটী। তাহারা সম্ভবতঃ নেপাল ও কৌশাম্বীর পূর্ব্ব কি দক্ষিণ পূর্ব্বে বাস করিত।

(৮) বৎস অথবা বংশ, যার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। ইহা অবন্তীর উত্তরে যমুনার পাড়ে অবস্থিত ছিল।

(৯) কুরুদের দেশ, যার রাজধানী ছিল বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটে ইন্দ্রপ্রস্থে।

(১০) কুরুদের রাজ্যের পূর্ব্বে দুইটি পাঞ্চাল রাজ্য ছিল। উহাদের রাজধানী ছিল কপিল এবং কনৌজে।

(১১) মৎস্যদেশ, কুরুরাজ্যের দক্ষিণে এবং যমুনার পশ্চিমে।

(১২) শূরসেনদের রাজ্য, মথুরায় উহার রাজধানী ছিল। মৎস্যদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও যমুনার পশ্চিমে উহা অবস্থিত।

(১৩) গোদাবরী তীরে আর্যকদের রাজ্য। উহার রাজধানী ছিল পোটানা অথবা পোটালী।

(১৪) অবন্তী, যাহা পরে মালব নামে পরিচিত। উজ্জয়িনী উহার রাজধানী ছিল।

(১৫) গান্ধার, বর্ত্তমান কান্দাহার, পূর্ব্ব আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাব লইয়া। তক্ষশীলা উহার রাজধানী।

(১৬) কম্বোজ, বর্ত্তমান সিন্দ্। দ্বারকা উহার রাজধানী।

উল্লিখিত বিবরণ ছাড়াও দক্ষিণ ভারত ও পঞ্জাবের অধিকাংশ রাজ্য সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সকল রাজ্যের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কোশলই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন রাজ্য ছিল। কিন্তু মগধের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে উহার গৌরব লুপ্ত হইতে লাগিল এবং পরে উহা মগধের অধীনে আসিয়াছিল। মহাভারতেও দেখিতে পাই যে ভারতে ও তৎসীমানায় দুই শত জাতি বাস করিত। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই ভারতবর্ষে যে সমস্ত জাতি বাস করিত তাহার উল্লেখ আছে, যথা— কুরু ও পঞ্চালেরা মধ্যদেশে; কামরূপের লোকেরা পূর্ব্বে; ইত্যাদি। প্রাচীন কালে রাজ্যগুলি সাধারণতঃ আকারে ছোট থাকায় ক্ষমতাবলে যোদ্ধারা বহু রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে মগধ রাজ্য রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু ও মহাপদ্মনন্দের অধীনে উত্তর ভারতে এক বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহাই তাহার উন্নতির চরম নয়। আলেক্জেণ্ডার ভারত হইতে চলিয়া গেলে চন্দ্রগুপ্ত তদীয় মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহার শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। পরে তদীয় পৌত্র অশোক চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণ সীমানার কয়েকটি রাজ্য ভিন্ন সমগ্র ভারত নিজের অধীনে

আনিয়াছিলেন। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র হইল তখন অন্ধ্রদেশ। তাহারা সমগ্র দক্ষিণাপথ ও উত্তর ভারতের কিছুটা তাহাদের অধীনে আনয়ন করিয়াছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত ও তদীয় পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মগধ রাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিয়া লুপ্ত গৌরব কতকটা উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রথম ভাগে কয়েকজন গুপ্ত সম্রাটের অধীনে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত ছিল এবং দেশের অন্যান্য বহু রাজ্য মিত্রশক্তিরূপে গুপ্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে হূণদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। তখন হইতে গুপ্ত রাজারা স্থানীয় রাজ্যের কতকাংশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। মালবরাজ যশোবর্দ্ধন সম্রাট্ পদে আরোহণ করিতে মনস্থ করিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের ক্ষমতা কনৌজরাজ হর্ষবর্দ্ধনের উপর চলিয়া গেল। তাঁহার ভীমবিক্রমে ও সুশাসনে উত্তর ভারতের খণ্ডরাজ্যগুলি পুনরায় একত্রিত হইয়াছিল। বিন্ধ্য পর্ব্বত ছাড়াইয়া চালুক্যেরা এক ক্ষমতাশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের রাজত্ব লইয়া রাষ্ট্রকূট নামক আর এক ক্ষমতাশালী জাতির সহিত তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল এবং অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে বঙ্গের পালরাজারা এক বিশাল রাজ্যের প্রভু হইয়া বসিলেন। দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে চোলদের অভ্যুত্থান হয় এবং রাজেন্দ্র

চোলের অধীনে তাহারা যে শুধু সমগ্র দক্ষিণ ভারত জয় করিয়াছিল তাহা নয়, কলিঙ্গ এবং সিংহলও জয় করিয়াছিল। ইত্যবসরে রাজপুতেরা অবতীর্ণ হইল। তাহারা কনৌজ, দিল্লী, মধ্যভাবত অধিকার করিয়া তাহাদের নামানুসারে তথায় **রাজস্থানের** পত্তন করিল। প্রাচীন বনাম নব্য জাতির মধ্যে প্রভুত্ব নিয়া সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে লাগিল। কিন্তু রাজা হর্ষের পর আর কেহই ভারতের কোন অংশে দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন নাই। এইরূপে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশটা স্বাধীন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তাদের দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল।

সভা ও সমিতি

বৈদিক সাহিত্যে 'সভা' ও 'সমিতিকে' প্রজাপতির যমজ কন্যা বলিয়া ধরা হইয়াছে। সভা ও সমিতির সাহায্যে জনসাধারণকে শাসন করিবার প্রথা বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই ভারতে ছিল। সর্ব্বসাধারণের মিলিত সভাকে 'সমিতি' বলিত। রাজ্যের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের আলোচনা ও মীমাংসার জন্য এই সমিতি ডাকা হইত। এই সমিতিতেই রাজা মনোনীত হইতেন। মন্ত্রণা সভাকে 'সভা' বলা হইত বিচার, সৈন্য প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এই সভাতেই হইত।

অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে প্রস্তাব গৃহীত হইত। বয়স, চরিত্র ও গুণানুসারে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেন। সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। সভায় সভ্যদের নির্দ্দিষ্ট আসন ছিল সভ্যদের সভার ভিতর কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। কোন এক জনের বক্তৃতা শেষ না হইতে অন্য কেহ বক্তৃতা করিতে পারিত না। কিন্তু বিশেষ কোন দরকারী কাজ না থাকিলে যে পর্য্যন্ত কোন সভ্য কিছু বলিতে আহূত না হইত সে পর্য্যন্ত কিছু বলিতে পারিত না। শাসন ব্যাপারে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে মন্ত্রি-পরিষদে উহার আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া লইত। রাজ্যের বড় বড় সরকারী ও বে-সরকারী লোক লইয়া পরিষদ্

গঠিত হইত। সভ্য সংখ্যা ঠিক ঠিক বলা যায় না; তবে আবশ্যক মত সভ্য যে গৃহীত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়ে সেখানে আলোচনা চলিত। সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ না হয় সেই দিকে মন্ত্রীদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজা প্রকৃত পক্ষে সভার মত না লইয়া কিছুই করিতে পারিতেন না। সমস্ত আইন কানুনই সভা কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইত।

উত্তর ভারতই যে কেবল সভা দ্বারা শাসিত হইত তাহা নয়, দক্ষিণ ভারতেও খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাঁচটি সভা ছিল; যথা:—(১) সাধারণ সভা, সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে লোকদের মনোনীত প্রতিনিধি ডাকা হইত। (২) পুরোহিতদের সভা, রাজ্যের ধর্ম্মানুষ্ঠানের তাঁহারা বিধান দিতেন। (৩) চিকিৎসকদের সভা, তাঁহারা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। (৪) জ্যোতিষীদের সভা, তাঁহারা লোকদের ধর্ম্মোৎসবের সময় স্থির করিতেন। (৫) মন্ত্রী সভা, তাঁহারা কর আদায় ও ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিতেন এবং শাসন ও বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।

রাজা

উত্তরকালে রাজ্য শাসনের জন্য সমাজে রাজার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। রাজা (স্বামী), মন্ত্রী (অমাত্য), রাজ্য (জনপদ বা রাষ্ট্র), দুর্গ (সংরক্ষিত নগর), কোষাগার, সৈন্য ও মিত্র—রাজনীতির এই সাতটি অঙ্গের মধ্যে রাজাই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। মহাভারতে রাজা মনোনয়ন করিবার জন্য লোকদিগকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং রাজা না থাকিলে যে সকল অমঙ্গল ঘটিতে পারে তাহাও সেখানে বর্ণিত আছে, যথা—সূর্য্য ও চন্দ্রের অবর্ত্তমানে যেমন সমস্ত প্রাণী ঘনঘোর অন্ধকারে তাহাদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তেমনি মানুষেরাও রাজা ব্যতীত এক পা অগ্রসর হইতে পারে না। রাজা যদি প্রজা পালন না করেন বলবানেরা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে; ধনরত্ন এমন কি স্ত্রীপুত্র রক্ষাও দুষ্কর হইয়া উঠিবে; দেশের চারিদিকে দস্যু তস্করের উৎপাত বাড়িয়া যাইবে; বিবাহের জাতিগত বন্ধন সমস্ত টুটিয়া যাইবে; দেশের শিল্প বাণিজ্যের পতন হইবে; মনুষ্যত্ব বা উচ্চ আদর্শ বলিয়া কিছুই থাকিবে না। যাগযজ্ঞ অচল হইয়া পড়িবে; বেদ সকল লুপ্ত হইবে; সমাজের অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত থাকিবে না; দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং সকল রকম অন্যায় অবিচারের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে।

বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে, সেইরূপ সমাজের মধ্যে সবলেরা দুর্ব্বলকে কবলিত করিয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ মাৎস্য ন্যায়ে প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ বৈবস্বত মনুকে তাহাদের রাজা বলিয়া নির্ব্বাচিত করে এবং শস্যের ষষ্ঠাংশ এবং পণ্য দ্রব্যের দশমাংস রাজকর বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই ধার্য্য করে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরবর্ত্তী সময়েও নরপতিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ প্রজাবর্গকে নিরাপদে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন। রাজাতে ইন্দ্র এবং যমের কর্ত্তব্য একত্র মিশ্রিত আছে। তিনি প্রত্যক্ষরূপে দণ্ড ও পুরস্কারের কর্ত্তা। যে রাজাকে অপমান করিবে সেই দৈব শাস্তি ভোগ করিবে। সুতরাং কোন মতেই রাজাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, কারণ পরমেশ্বর সমুদায় চরাচর রক্ষার জন্য পৃথিবীতে রাজাকে পাঠাইয়াছেন। সুতরাং তিনি ভগবানের অবতার, সাক্ষাৎ নরদেবতা। জীবধর্ম্ম রক্ষা ও দুষ্কৃত দমনের জন্যই রাজার সৃষ্টি হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে সম্ভবতঃ মনোনয়ন দ্বারা রাজা স্থির হইত। নিম্নোক্ত ঋগ্‌বেদের স্তোত্র (ঋক্ ১০।১৭৩) হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়—"আমি আপনাকে সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিতে আনিয়াছি, আপনি মধ্যস্থলে অবস্থান করুন; সমস্ত প্রজারা আপনাকে মনোনীত করুক, আপনার রাজত্ব আপনা হইতে যেন কখনও বিচ্যুত না হয়।" দেশের লোকেরা যেমন রাজা মনোনীত করিত, তেমনি তাহারা রাজাকে রাজপদ হইতে চ্যুত করিতেও পারিত। এইভাবে ক্রমশঃ বংশানুক্রমে রাজা হওয়ার

প্রথা প্রচলিত হয়। শেষ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবার সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, উত্তরাধিকারসূত্রেও কেহ বিশেষ কোন কারণে রাজপদে অভিষিক্ত হইতে অনুপযুক্ত থাকিলে, রাজ-বংশের অন্য একজন তাহার স্থানে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন। সুশ্রী, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান্, বিচক্ষণ, প্রতাপশালী প্রভৃতি ব্যক্তি হইতেই সাধারণতঃ রাজা মনোনীত হইত। মহাভারতেও তাহাই দেখা যায়—ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ থাকায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যের সঙ্কট মুহূর্ত্তে লোকেরা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অর্পণ করিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিলে প্রজাবর্গ যুধিষ্ঠিরকেই রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের বীরত্ব ও শাসনকার্য্যে পটুতা দেখিয়া তদীয় পিতা চন্দ্রগুপ্ত তাহার পর তাহাকে রাজা মনোনীত করিয়াছিলেন। কোন কোন কারণ বশতঃ মন্ত্রীরাও রাজা বাছিয়া লইতেন। গৌড়াধিপ কর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধন হত হইলে, প্রধান মন্ত্রী ভণ্ডি মন্ত্রীমণ্ডল ও প্রজাবর্গের সাক্ষাতে হর্ষবর্দ্ধনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধবিবাদ দেখা দিলে, কোন কোন সময়ে তাহারা নিজেদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়া লইত। সন্ধি দ্বারা কৌরব ও পাণ্ডবেরা তাহাদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়া লইয়াছিল। আর্য্য ভারতের ইতিহাসে যে কয়েকজন মহিলা-রাজের কথা আমরা শুনিতে পাই, তাঁহারা কাশ্মীর ও সিংহলে রাজত্ব করিতেন। তন্মধ্যে কাশ্মীরের রাণী

দিদা (Didda) এবং সিংহলের রাণী লীলাবতীর নামই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। উভয়েই বিধবা ছিলেন, কিন্তু দেশের সঙ্কট মুহূর্ত্তই তাহাদিগকে রাজপদে উন্নীত করিয়াছিল। শাস্ত্রানুমতে রাজা ক্ষত্রিয় জাতির লোক হইবেন, কিন্তু ইতিহাসে অন্যান্য বংশ সমুদ্ভূত রাজার নামও পাওয়া যায়। নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ শিশুনাগ বংশের শেষ রাজার ঔরসে কোন এক শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মিয়াও নিজকে মগধের রাজবংশ সমুদ্ভূত বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজারা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এইরূপে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজপদ প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে রাজা সম্বন্ধে একটা আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়া উঠিল।

প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থান ত ছিলই না, পরন্তু প্রজার কল্যাণের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া চলাই তাহাদের বিশেষত্ব ছিল। তজ্জন্য প্রজাবর্গও তাহাদের রাজাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া চলিত ও তাঁহার বাধ্য থাকিত। রাজ্যের কর্ম্মচারী হিসাবে রাজা নিজকে সকলের হিতকল্পে সর্ব্বদাই বিলাইয়া দিতেন—ইহাই হইল প্রাচীন ভারতের রাজনীতির একটা বিশেষত্ব। অর্থ শাস্ত্রের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—

“প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্॥”

প্রাচীন ভারতে রাজা হইতে আইনের মর্য্যাদা শ্রেষ্ঠ ছিল। রাজা বিম্বিসার সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে যে বিম্বিসারের রাজধানীতে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড ঘটিত। তিনি উহা দমন করিবার জন্য নিয়ম করিয়া দিলেন যে যাহার ঘরে আগুন লাগিবে তাহাকে বনে বাস করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন তাহার রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিল। তখন রাজা মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—'আমি বনবাসী হইব।' সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের ভার দিয়া 'আমি দেশের আইন পালন করিবার জন্য বনে যাইতেছি' এই বলিয়া বনে চলিলেন। শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলাই রাজাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। বিপদ আপদকালে তাঁহারা রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারীর ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ভারতের প্রাচীন যুগে ঋষিদের খুবই প্রাধান্য ছিল, রাজারাও তাহাদিগকে সম্মান ও পূজা করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে রাজধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া তদনুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ইহা ছাড়া রাজা যেখানেই প্রজা পীড়ন করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারিতা চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইতেন, সেখানেই প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিত। ফলে রাজা রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নন্দবংশের পরিণামের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রধানতঃ রাজার কর্ত্তব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—শাসন, বিচার ও সৈন্য পরিচালনা করা। মানুষের গতিবিধি অবলোকনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজ-সরকার

কর্ত্তৃক লোক নিযুক্ত থাকিত। তাহারা আবার তাহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্যের জন্য রাজার নিকট দায়ী ছিল। রাজার নামেই বিচারালয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কখন কখনও রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। ইহা ছাড়া নাবালক শিশু ও অনাথদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ এবং তাহাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করাও রাজার কর্ত্তব্য ছিল।

তৎকালে রাজারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে সভাগৃহে যাইতেন এবং তথায় যাইয়া লোকদের কোন অভাব অভিযোগ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিতেন। জ্ঞানী ও সদাশয় রাজারা দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সময়ের একটা তালিকা (Time Table) করিয়া লইতেন। চাণক্য দিনকে সমান আট ভাগে এবং রাত্রিকে সমান আট ভাগে ভাগ করিতে পরামর্শ দিয়া প্রতিদিন সুবিধামত নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন।—

দিবাভাগে

(১) রাজ্য রক্ষার উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া।

(২) লোকের অভাব অভিযোগের খোঁজ খবর লওয়া।

(৩) স্নান, আহার ও অধ্যয়ন।

(৪) কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নিকট হইতে হিসাব লওয়া।

(৫) প্রিভিকাউন্সিলে যোগ দেওয়া।

(৬) জলযোগ অথবা মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করা।

(৭) হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং অস্ত্রাগার সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করা।

(৮) সাময়িক বিষয়ে প্রধান সেনাপতির সহিত পরামর্শ করা।

রাত্রিকালে

(১) গুপ্তচরদের নিকট হইতে খবর নেওয়া।

(২) স্নান, আহার ও অধ্যয়ন।

(৩) (৪) (৫) শয়ন।

(৬) শাস্ত্র ও রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনুধাবন বা চিন্তা করা।

(৭) মন্ত্রীদের নিকট হইতে পরামর্শ লওয়া এবং গুপ্তচরদিগকে বাহিরে প্রেরণ করা।

(৮) ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান।

কিন্তু বিশেষ দরকারী কাজগুলি যে কোন সময়ে সত্বর করা হইত।

শুক্রনীতিতেও রাজাকে এইরূপ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সময়ের তালিকা কিছু অন্য ধরণের। আয় ব্যয় সম্বন্ধে বিবেচনা—দুই মুহূর্ত্ত, স্নান—এক মুহূর্ত্ত, ধর্ম্মানুষ্ঠান—দুই মুহূর্ত্ত, ব্যায়ামাদি—এক মুহূর্ত্ত, পুরস্কার বিতরণ—এক মুহূর্ত্ত, রাজ্যের কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ—চারি মুহূর্ত্ত, মধ্যাহ্নের ভোজন—এক মুহূর্ত্ত, পুরানো ও নূতন ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা—

এক মুহূর্ত্ত, বিচারকদের সহিত পরামর্শ—তুই মুহূর্ত্ত, শিকার ও খেলাধূলা—তুই মুহূর্ত্ত, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন—এক মুহূর্ত্ত, ধর্ম্মানুষ্ঠান—এক মুহূর্ত্ত, রাত্রির আহার—এক মুহূর্ত্ত, গুপ্তচরদের সহিত কাজ—তুই মুহূর্ত্ত, নিদ্রা - আট মুহূর্ত্ত, এইরূপে দিবা রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টাকে ত্রিশটি মুহূর্ত্তে ভাগ করা হইয়াছে।

এইভাবে প্রাচীন ভারতে রাজগণ তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য ও গুণাবলীর জন্য প্রজাদের নিকট গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু ছিলেন।

অশোক, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি রাজারা ব্যক্তিগত ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া তাহাদের রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও রাজাদের নানারকম বিপদের আশঙ্কা সব সময়েই ছিল। গুপ্তভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিত। তজ্জন্য শাস্ত্রে রাজাদিগকে আহার্য্য দ্রব্য নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া উহার সহিত বিষদোষ নাশ করে এমন ঔষধ মিশ্রিত করিয়া খাইতে এবং সব সময় উপযুক্ত শরীর-রক্ষক লইয়া চলাফেরা করিতে বলা হইয়াছে। রাজপুত্রদেরও রাজত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রাজনীতি ও সামরিক কৌশল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইত। উদাহরণ স্বরূপ অশোক তাহার পিতার জীবদ্দশাতেই তুইটি প্রদেশের শাসন-কার্য্য চালাইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত যুবরাজ অবস্থাতেই একজন বড় যোদ্ধা হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন তদীয় পিতা কর্ত্তৃক হূণদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

উত্তরাধিকারসূত্রে বা মনোনয়ন দ্বারা রাজার সিংহাসন লাভের পর কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহে রাজার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইত। উহাতে মন্ত্রপাঠ ও নানা-রকম আচার পদ্ধতি অনুসৃত হইত। যাহারা রাজার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিত তাহাদিগকে রাজকর্ত্তা বা রাজকৃৎ (King maker) বলিত। রাজ্যাভিষেক উৎসবের প্রধান ক্রিয়া বা যজ্ঞ হইল বাজপেয়, রাজসূয়, পুনরভিষেক এবং ঐন্দ্রমহাভিষেক। বাজপেয় যজ্ঞকারী 'সম্রাট্' আখ্যা, রাজসূয় যজ্ঞকারী সাধারণ রাজসম্মান, পুনরভিষেককারী রাজা, সম্রাট্. ভৌজ, মহারাজ প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইত। সার্ব্বভৌম রাজাদের দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞ এবং দিগ্বিজয়ী রাজাদের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইত।

রাজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময়ে যে মন্ত্র পঠিত হইত, তাহা ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৭৩ সূক্তে এইরূপ ভাবে পাওয়া যায়, যথা—

(১) হে রাজন্! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও; অটল, অবিচলিত এবং স্থির হইয়া থাক, তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়।

(২) তুমি এই স্থানেই পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত হইয়া থাক, রাজ্যচ্যুত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে থাক। এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর।

(৩) অক্ষয় হোমদ্রব্য পাইয়া ইন্দ্র এই নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সোম তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মণস্পতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

(৪) আকাশ নিশ্চল; পৃথিবী নিশ্চল; এই সমস্ত পর্ব্বত নিশ্চল; এই বিশ্বজগৎ নিশ্চল; ইনিও প্রজাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজা হইলেন।

(৫) বরুণ রাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিত রূপে ধারণ করুন।

(৬) এই দেখ অক্ষয় হোম দ্রব্য সহকারে অক্ষয় সোমরসকে সংযোজিত করিতেছি, অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাদিগকে একায়ত্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করিয়াছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজাকে যে সুন্দর পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহার মর্ম্মার্থ এই—আপনি যদি যথার্থই শাসনকর্ত্তা হইবেন, তাহা হইলে অদ্যাবধি সবল ও দুর্ব্বলকে সমানভাবে শাসন করুন; অবিরত সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলবিধানে কৃতসঙ্কল্প হউন; এবং সমস্ত আপদ্ বিপদ্ হইতে দেশকে রক্ষা করুন।

রাজার অভিষেক উৎসব উপলক্ষে রাজধানীতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমোদ প্রমোদের অন্ত ছিল না। রাজ্যের সমস্ত প্রজাগণ সানন্দে তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গন সমূহ পত্র পুষ্প, পতাকা ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করিত। দিকে দিকে শুনা যাইত রাজার জয়, দীর্ঘায়ুকামনা, স্তবস্তুতি ও বন্দনা।

রাজা তদীয় মন্ত্রীমণ্ডলী ও রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারিদের সহায়তায় কেন্দ্রীয় শাসন চালাইতেন। এই মন্ত্রীমণ্ডলী বাছাই করিতে প্রাচীনকালে অত্যন্ত যত্ন করা হইত। ব্যক্তিগত চরিত্র মাধুর্য্য ও ক্ষমতার গুণেই যে তাহাদের বাছিয়া লওয়া হইত তাহা নয়, বংশ মর্য্যাদার স্থান উহাতে যথেষ্ট ছিল। "যিনি উচ্চ কুলে জাত, দেশীয় প্রতিপত্তিশালী ; শিল্প ও বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত ; জ্ঞানী ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ; স্মৃতিশক্তিবান্, সক্ষম ; বাগ্মী ; বুদ্ধিমান্, উৎসাহী, সহিষ্ণু ; সচ্চরিত্র ; রাজকার্য্যে গভীর মনোযোগী, সদ্গুণে ভূষিত ; বলশালী, স্বাস্থ্যবান্, সাহসী ; দীর্ঘসূত্রতাবিহীন এবং মনের অস্থিরতা শূন্য ; স্নেহময় ও শত্রুশূন্য তিনিই মন্ত্রীপদের অধিকারী।" চাণক্য বলিয়াছেন এই সমস্ত অমাত্যদিগের মধ্যে যাহাদিগকে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রলোভন দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাদিগকেই দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগে কার্য্য দিতে হইবে। আর্থিক প্রলোভনে যাঁহারা প্রলোভিত হন নাই তাঁহাদিগকে রাজস্ব আদায় বিভাগে ও কোষ বিভাগে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহারা কামপ্রলোভনে প্ররোচিত হয়েন নাই, তাঁহাদিগকে বিহার-ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এইরূপে বিভিন্ন বিষয়ের ভার এক একজন মন্ত্রীর উপর দেওয়া হইত।

শুক্রনীতিতে যে দশজন মন্ত্রীর উল্লেখ আছে তাহা এই—পুরোধস্ (পুরোহিত), প্রতিনিধি, প্রধান (Chief Secretary), সচিব (Minister of Military affairs), মন্ত্রী, প্রধান বিচার পতি, আইনজ্ঞ পণ্ডিত (ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ), সুমন্ত্রক (Finance Minister), অমাত্য (Land Revenue Minister) এবং দূত।

মন্ত্রীরা রাজার নিকট তাহাদের কর্ত্তব্যের জন্য যেমন প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকিতেন, তেমনি পরোক্ষভাবে প্রজাদিগের নিকট ও দায়ী থাকিতেন। রাজার অনুপস্থিতে মন্ত্রীরা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতেন। নিকটস্থ কর্ম্মচারীর সহিত রাজা কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং যাহারা দূরে থাকেন, পত্রদ্বারা তাহাদের নিকট হইতে মন্ত্রণা গ্রহণ করিতেন। বিশেষ কোন জরুরী কার্য্য উপস্থিত হইলে তিনি মন্ত্রীসভা আহ্বান করিতেন এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির যে মত হয়, সেই মত গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে শ্রাবস্তির একজন নরপতি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। তিনি প্রত্যহ পাঁচলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করিতে মন্ত্রীদিগকে আদেশ করিলে মন্ত্রীরা রাজ্যের আসন্ন অমঙ্গল ও প্রজাদের নিকট রাজার ব্যক্তিগত সম্মান হানির আশঙ্কা করিয়া উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বিচার বিভাগ

বৈদিক যুগের প্রারম্ভে জাতীয় সভাতে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। বিচার করিবার প্রণালীও অত্যন্ত সাধারণ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ রাজ্যের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় এবং রাজকীয় ক্ষমতার অভ্যুদয়ে রাজাই শ্রেষ্ঠ বিচারক বলিয়া গণ্য হইল। তখন হইতে ধীরে ধীরে বিচার পদ্ধতির উন্নতি হইতে লাগিল। বৃহস্পতির মতে বিচারসভা চারি প্রকারের ছিল। সহর ও গ্রামে স্থায়ী বিচারসভা হইত। অস্থায়ী বিচারসভা বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বিচার করিত। রাজসভায় রাজসমীপে বিচার হইত। ইহা ছাড়াও রাজার আর একটি বিচারসভা ছিল, (court furnished with the king's signet ring or seal), উহার বিচার কার্য্য প্রধান বিচারকের তত্ত্বাবধানে চালিত হইত। উপরি উক্ত বিচার সভার মধ্যে রাজার কাচারীই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত। উহা রাজধানীতে থাকিত এবং সময় সময় রাজা নিজেও তথায় বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু প্রায়ই তথায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণ অধ্যক্ষ বা সভাপতি রূপে নিয়োজিত হইতেন। প্রথমে বিশেষ কোন কারণ বশতঃ অস্থায়ী ভাবে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলেও কালক্রমে তথায় তাঁহাদের পদ স্থায়ী হইয়া যাইত। এমন কি তাঁহারা প্রধান বিচারপতির পদেও উন্নীত হইতেন। এই প্রকারে কয়েকজন শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি এবং প্রধান

বিচারপতি লইয়া রাজা শ্রেষ্ঠ বিচারসভা গঠন করিতেন। নিম্ন বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত মোকদ্দমার আপীলের চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভবতঃ এইখানেই হইত।

বর্ত্তমানকালের জুরীদের দ্বারা বিচারপদ্ধতি (The Jury System) তৎকালের জুরীপ্রথা হইতে অনেকাংশে পৃথক্। তৎকালে বিচারসভার তিনজন অথবা পাঁচজন সভ্য 'জুরার' ও বিচারকের কাজ করিত। কিন্তু বিচারের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার ভার প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত ছিল। তবে সভ্য ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত লোক ধর্ম্মাধিকরণে (কোর্টে) উপস্থিত থাকিত, বিশেষ কোন ব্যাপারে তাহারা তাহাদের মত ব্যক্ত করিতে পারিত।

প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় একবার কি দুইবার বিচার-সভা বসিত। বিচারগৃহ পরম পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য হইত। বিচারালয় সকলের নিকট উন্মুক্ত ছিল সত্য, কিন্তু প্রাচীন ভারতে আইনের চক্ষে সকলে সমান ছিল না। উচ্চ বর্ণের লোকেরা গুরুপাপ করিয়াও লঘুদণ্ডে দণ্ডিত হইত, অপরপক্ষে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা লঘুপাপ করিয়া গুরুদণ্ড ভোগ করিত। যাহা হউক, তৎকালের বিচার কার্য্য যে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইত সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজা স্বয়ং বিচক্ষণ মন্ত্রণাদাতাদের সহায়তায় বিচারকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। তবে সাধারণতঃ তিনি দেওয়ানী বিচার অপেক্ষা ফৌজদারী বিচার বেশী করিতেন। দূরবর্ত্তী বিচারালয়সমূহে

রাজপ্রতিনিধিরা বিচার করিতেন। রাজা অথবা রাজকর্ম্মচারীরা বিশেষ কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে অসমর্থ ছিলেন। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে অথবা অন্য কাহারও দ্বারা কোর্টে কোন মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিতেন না। কিন্তু বিশেষ কোন দূষণীয় ব্যাপারের বিচার ও উহার সমুচিত শাস্তি বিধান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল। বিচার কার্য্যে রাজা ও তদীয় কর্ম্মচারীদিগকে দেশের প্রচলিত আইন ও প্রথা মানিয়া চলিতে হইত। বিবাদিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত দেনাগুলির শতকরা পাঁচ ভাগ এবং অস্বীকৃত অথচ প্রমাণীকৃত দেনাগুলির শতকরা দশভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল। উক্ত প্রাপ্য অংশ বিচারকগণকে দেওয়া হইত। আইনজ্ঞদের সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজা মোকদ্দমার বিচার করিতেন না এবং আইন অনুসারে একবার কোন বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা হইয়া গেলে রাজা উহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। বাদী প্রতিবাদী এবং সাক্ষীদের আচরণ, অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত, ইসারা, কথা বলিবার ভাবধারা, বিভিন্ন লোকদের বিধিনিষেধ, স্থানীয় রীতি-নীতি, পারিবারিক নিয়ম-কানুন, পণ্যজীবিদের প্রথা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বিচারকগণের নজির-সমূহের প্রতি রাজার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত।

কি কি কারণে মোকদ্দমা বাধিতে পারে, আইন প্রণেতারা তাহার হেতু দর্শাইয়াছেন, যথা—(১) ঋণ দানের টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য (recovery of debts) (২) জমা ও জামিন সম্বন্ধীয় ব্যাপারের দরুণ (deposit and pledge)

(৩) অন্যের দ্রব্য নিজের বলিয়া বিক্রয় করা (sale without ownership) (৪) অংশীদারের ভাগ সম্বন্ধীয় (concerns among partners) (৫) দানপত্র অস্বীকার করণ (disownment of gifts) (৬) বেতন অনাদায় (non-payment of wages) (৭) চুক্তিপত্র বা একরারনামা না মানিয়া চলা (non-performance of agreements) (৮) ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করা (recession of sale and purchase) (৯) মালিকদের মধ্যে গো মহিষাদি লইয়া ঝগড়া (dispute between owners of cattle and herdsmen) (১০) জমির সীমানা লইয়া কলহ (dispute regarding boundaries) (১১) মারপিট (assault) (১২) অপবাদ দেওয়া (defamation) (১৩) চুরি (theft) (১৪) দস্যুতা ও লুণ্ঠন প্রভৃতি (robbery and violence) (১৫) ব্যভিচার (adultery) (১৬) স্ত্রীপুরুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় (duties of man and wife) (১৭) উত্তরাধিকার ও ভাগবাটোয়ারা বিষয়ে (inheritance and partition) (১৮) জুয়া ও পণ সম্বন্ধীয় ব্যাপার (gambling and betting) ।

কাহারও কাহারও মতে উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলি আরও অনেক ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। বাদীর বক্তব্য, বিবাদীর উত্তর শুনা ; উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিচার এবং অতঃপর চূড়ান্ত মীমাংসা করা প্রধানতঃ এই চারিটি স্তরের মধ্য দিয়া বিচার কার্য্য সমাধা করা হইত।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে বিচারপ্রার্থীরা লিখিত অথবা মৌখিক নালিশ দ্বারা মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিত। ঘটনার তারিখ ও স্থান, দাবী ও দোষের বিবরণ, বাদী ও বিবাদীর নাম ধাম উহাতে লিখিত হইত। উভয় পক্ষের উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণাভাবে মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যাইত। সুতরাং আইনজ্ঞ কোন একজন ব্যক্তির দ্বারা বাদীকে তাহার নালিশ-পত্র লিখিয়া লইতে হইত। নারদের মতে উহা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত করা উচিত, কারণ তাহাতে কম বা অতিরিক্ত মাত্রায় দাবী, অনর্থমূলক কথা, বক্তব্য বিষয়ের অসামঞ্জস্য প্রভৃতি দোষের সম্ভাবনা থাকা উচিত নয়। পরবর্ত্তী কার্য্য হইল কোর্টে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারী করা। বিবাদী সমন পাইয়া কোর্টে হাজিরা দিতে বাধ্য। অন্যথা বাদী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দ্বারা তাহাকে কোর্টে উপস্থিত করাইতে পারিত। নালিশ-পত্রে বাদীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিবাদীকে লিখিত উত্তর দিতে হইত। উক্ত উত্তর চারি রকম হইত, যথাঃ—অস্বীকার বা মিথ্যা কথন, নিজ অপরাধ অস্বীকার করণ, বিশেষ ওজর আপত্তি ও পূর্ব্ব বিচারের অজুহাত দর্শান। আবেদন পত্রের উত্তর চাহিবার পূর্ব্বে বাদী তাহার আবেদন পত্র ইচ্ছামত সংশোধন করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু উত্তর পাওয়ার পর আর কোনরূপ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতে পারিত না। বাদীকে বিবাদীর উত্তরের জবাব দাখিল করিতে হইত। সাধারণ মোকদ্দমার মীমাংসা শীঘ্রই

হইত। কিন্তু যদি কোন মোকদ্দমা বিশেষ কোন ঘটনা বা আইনের আবশ্যকীয় প্রশ্নে জড়িত থাকিত তখন উভয় পক্ষকে প্রস্তুত হইবার জন্য সময় দেওয়া হইত। বিবাদী যখন মোকদ্দমা বা দাবী অস্বীকার করিত, বাদীকে তখন তাহার দাবী প্রমাণ করিতে হইত। কোন কোন ব্যাপারে বিবাদীর উপরে প্রমাণ করিবার ভার চাপাইয়া দেওয়া হইত। বাদী যদি সাক্ষী-যোগাড় করিতে না পারে এবং দেড় মাসের মধ্যে কোর্টে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহার অভিযোগ টিকিত না। অধিকন্তু বাদীর মোকদ্দমা করিবার ন্যায্য কোন কারণ ছিল না এইরূপ প্রমাণিত হইলে, কোর্ট হইতে তাহার জরিমানার আদেশ হইত। বিধি অনুসারে প্রত্যভিযোগের অনুমতি দেওয়া হইত না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যভিযোগ গৃহীত হইত। কোর্ট যদিও সমস্ত রকমের প্রমাণ চাহিতেন, তথাপি চুরি প্রভৃতি ব্যাপারে সাক্ষীর মৌখিক প্রমাণই যথেষ্ট হইত। মনুর মতে যে কোন পুত্রবান পুরুষ প্রতিবেশী উপযুক্ত সাক্ষীরূপে গণ্য হইত। প্রাচীন ভারতে সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত মোকদ্দমা সমূহ প্রায়ই দলিল পত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইত। নারদের মতে খাঁটি দলিল প্রস্তুত করিতে হইলে "সাক্ষীদের উহাতে নাম সই করা উচিত। উহার ভাষা যেন সহজ বোধ্য হয় ও বানানের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, স্থানীয় প্রথা ও সাধারণ আইন উহাতে মানিয়া চলা উচিত এবং উহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া উচিত।" বিচারকেরা যে দলিল ও সাক্ষীর সংখ্যা দেখিয়াই

স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবে তাহা নয়; প্রত্যক্ষ, যুক্তি, অনুমান ও উপমান দ্বারা সাক্ষ্য প্রমাণের সত্যতা নিরূপণ করিবেন। সময়, বয়স, গুণ, বিষয়বস্তু, গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সাক্ষীর মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে ঐরূপ সাক্ষ্যে কোন কাজ হইত না। তখন স্বাক্ষীর হাবভাব দেখিয়া বিচারকদিগকে তাহার কথার সত্যতা অনুমান করিতে হইত। কোন মোকদ্দমার বিচার মিথ্যা ও উপযুক্ত প্রমাণাভাবের উপর ভিত্তি করিয়া হইয়াছে এইরূপ জানা গেলে বিচার পরিবর্ত্তিত করিয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দেওয়া হইত। প্রমাণ ছাড়াও শপথ বা দিব্য দ্বারা অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করা হইত। এই শপথ কিরূপে করান হইত তৎসম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই:—"বিচারকেরা ব্রাহ্মণকে সত্য বলিতে শপথ করাইবেন, ক্ষত্রিয়কে হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রাদি স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইবেন, বৈশ্যকে গবাদি পশু, স্বর্ণ ও শস্য প্রভৃতি দ্বারা শপথ করাইবেন, শূদ্রকে অগ্নি পরীক্ষা, জল পরীক্ষা বা শির স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইবেন।" বিচারের পর রায় দেওয়া হইত। দাবীকৃত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া ও বিজিত পক্ষকে জরিমানা করাই দেওয়ানী বিচারের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। টাকা ধার দেওয়ার প্রথা তখনও ছিল। সুদ শতকরা দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। ঋণের টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য কোর্ট উপযুক্ত একটা সুদের মাত্রা ধার্য্য করিয়া দিতেন। কিন্তু ফৌজদারী বিচারে বিচারকেরা দোষীদিগকে জরিমানা, জেল, বেত্রাঘাত, শারীরিক

পীড়ন, বনবাস, মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি কঠোর শাস্তি বিধান করিতে পারিতেন। তবে মৃত্যুদণ্ড কদাচিৎ দেওয়া হইত। বিচারকেরা কোনরূপ আইন অমান্য করিলে বা কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিলে তাহাদের যে কেবল পাপ হইত তাহা নয়, কৃত পাপের জন্য শাস্তিও ভোগ করিতে হইত। সুতরাং প্রাচীন ভারতে আইন-কানুন ও বিচার পদ্ধতি যে কত উন্নত ছিল উপরি বর্ণিত বিবরণ পাঠে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন এবং মহৎ চিন্তাই ছিল প্রাচীন ভারতের লোকদের একমাত্র বিশেষত্ব। বৈদেশিক পর্য্যটকদের প্রশংসা-মূলক বিবরণ হইতেই এই কথাটার সত্যতা প্রমাণিত হয়। মেগাস্থেনিসের মতে—"তখন দেশে চুরি ডাকাতি কদাচিৎ হইত······তাহাদের আইন ও চুক্তির সরলতা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে তাহারা কদাচিৎ আইন আদালতের আশ্রয় লইত। জমা অথবা জামীন সম্বন্ধে তাহাদের কোন মোকদ্দমা ছিল না, সুতরাং সাক্ষী প্রমাণ ও দস্তখতের কোন দরকার হইত না; তাহারা শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট টাকা পয়সা, ধনরত্ন গচ্ছিত রাখিত। বাড়ীঘর ও ধন সম্পত্তি তাহারা বিনা পাহারায় ফেলিয়া রাখিত। ইহা হইতেই তাহাদের গুণবত্তা ও ধৈর্য্যশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।"

সমাজে অপরাধমূলক ও দূষণীয় কার্য্য যতটা অনুষ্ঠিত হইত, তদনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থাটা অনেকাংশে কঠোর ছিল। সম্ভবতঃ সমাজকে সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত করিবার জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা

অবলম্বিত হইয়াছিল। সমাজে ব্যভিচার যে কেবল গুরুতর পাপ ও অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত এমন নহে, পরন্তু উহা অতি জঘন্য ও ঘৃণিত দোষ বলিয়া গণ্য হইত। স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। সামান্য চুরির অপরাধে জরিমানা হইত; বহুমূল্যের দ্রব্যাদি চুরি করিলে অপরাধীর হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। চৌরাই মাল সহ ধৃত হইলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। এমনকি যাহারা চোরাই মাল গ্রহণ করিত এবং অপরাধীকে আশ্রয় দিত তাহাদেরও কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত। ডাকাতি অপরাধের শাস্তি ছিল অঙ্গচ্ছেদন; ভীষণ ও লোমহর্ষণ ডাকাতির জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। রাজকীয় মুদ্রা বা অনুশাসনলিপি জাল করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। মিথ্যা সাক্ষ্য মারাত্মক পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং এমন কি পরিশেষে উহার জন্য জাতি-চ্যুতিও ঘটিত। সুতরাং সমাজে মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রচলন একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির সাহিত্যে সত্যকথনের এইরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। মানহানি, গালিগালাজ এবং সামান্য আঘাতের জন্য অর্থদণ্ড হইত। কিন্তু আঘাতের ফলে হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে অপরাধীকে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। অগ্নি-সংযোগকারী, বিষদাতা, হত্যাকারী, দস্যু, বলপূর্ব্বক ভূমি দখলকারী এবং পরস্ত্রী হরণকারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার দেওয়া হইত। অসাবধানতার সহিত যানবাহনাদি পরিচালন এবং রাজপথ

কলুষিত করার অপরাধে উপযুক্ত অর্থদণ্ড হইত। মন্ত্রীগণ ও বিচারকেরা ঘুষ গ্রহণ করিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত। চিকিৎসকগণ চিকিৎসানৈপুণ্য দেখাইতে না পারিলে তাহাদের জরিমানা হইত। দেব বিগ্রহ ভঞ্জন ও প্রতারণার অপরাধে অর্থদণ্ড হইত। স্বর্ণকার প্রতারণা করিলে ধাতব পদার্থ টিকে ক্ষৌরযন্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা হইত। পুলিশের আইনকানুনসমূহ অত্যন্ত কঠোর ছিল। জুয়ারী, প্রকাশ্যে নৃত্যকারী ও গায়ক, ধর্ম্মপুস্তকের নিন্দাকারী, ধর্ম্মবিদ্বেষী নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তি ও মদ্য বিক্রেতাদিগকে নগর হইতে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাসিত করা হইত। প্রাচীন ভারতের লোকদের কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান উপজীবিকা ছিল ; সেই হেতু কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনও অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। আত্মহত্যা সমাজে অতিশয় নিন্দনীয় ছিল, এমন কি আইনানুসারে আত্মহত্যাকারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও নিষিদ্ধ ছিল। কোনও অপরাধীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবার বিশেষ অধিকার একমাত্র রাজার উপরই ন্যস্ত ছিল। উল্লিখিত বিধানগুলি কঠোর হইলেও বিদ্যাবয়োজ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আর্য্য বিচারকগণ অত্যন্ত সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত আইনগুলি প্রয়োগ করিতেন।

পুলিশ বিভাগ

শাসন বিভাগের মধ্যে, পুলিশ বিভাগ শ্রেষ্ঠ ছিল। পুলিশের দুই প্রকার কাজ ছিল, যথা—অপরাধের মাত্রা কমান বা শান্তিরক্ষা করা এবং অপরাধীদের ধরিয়া বিচারার্থে চালান দেওয়া। সুতরাং তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ লোকদের উপর নজর রাখিতে হইত। কোথাও চুরি হইলে পুলিশ কর্ম্মচারীরা যদি চোর ধরিতে না পারিত তবে তাহাদিগকে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইত। মনুসংহিতায় এইরূপ কথিত আছে যে প্রজাদিগের যে ধন চৌরে অপহরণ করে, তাহা চোরের নিকট হইতে লইয়া যাহার ধন তাহাকে দিবেন, তাহাকে না দিয়া যদি আপনি লয়েন, তবে চৌরের পাপ প্রাপ্ত হইবেন। পুলিশ বিভাগের সহিত যুক্ত আরও একটি বিভাগ ছিল তাহা গোয়েন্দা বিভাগ।

গোয়েন্দা বিভাগ

গুপ্তচরেরা অপরাধীদের সন্ধান দিয়া পুলিশকে সাহায্য করিত। তাহারা লোকদের রাজভক্তি বা রাজদ্রোহ মূলক ভাব সকল মন্ত্রীকে জানাইত এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের চক্ষে তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিত। তাহারা বিদেশী রাজাদের কর্ম্মপদ্ধতি ও অভ্যন্তরীণ কুমৎলব সম্বন্ধে সমাচার প্রেরণ করিত। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকে গায়ক, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, বোকা পথিক, যোগী প্রভৃতি নানারকম ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইত। যদিও তাহারা নানা ছল চাতুরীর আশ্রয় লইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিত, তথাপি তাহারা সৎ ও বিশ্বাসী ছিল। তাহারা রাজার 'চক্ষু ও কান' ছিল। তাহাদের চক্ষু দ্বারাই রাজাকে দেখিতে হইত, কামন্দক বলিয়াছেন—"যিনি তাহাদের চক্ষেও দেখিতে না পারেন, অজ্ঞতার দরুণ তিনি সমতল ভূমিতেও আছাড় খান ; কারণ, তাহাকে অন্ধ বলা হয়।"

দূত বিভাগ

চাণক্যের মতে যিনি মন্ত্রীর কার্য্য সুকৌশলে সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাকেই দূতের পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বিপক্ষের যে সকল কর্ম্মচারী বন্য প্রদেশের, সীমান্তের, নগরের এবং জনপদের কর্ত্তৃত্বে আছেন দূত তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবেন। তিনি শত্রুর অবস্থান এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র ও দুর্গাদির সহিত নিজ প্রভুর ঐ সকলের তুলনা করিবেন এবং আক্রমণীয় ও অনাক্রমণীয় স্থলগুলির বিষয়ও অবগত হইবেন। সন্ধি রক্ষণ, শেষ প্রস্তাব, মিত্র সংগ্রহ ও বন্ধুদিগের মধ্যে ভেদাভেদ করণ প্রভৃতি দূতের কাজ ছিল। দূত অনেক প্রকারের ছিল, যথা—নিসৃষ্টার্থ দূত (যাঁহার উপর কর্ত্তব্যের স্বাতন্ত্র্য অর্পিত থাকে), পরিমিতার্থ দূত (যাঁহার উপর কর্ত্তব্যের সীমা ধার্য্য করা থাকে) ও শাসনহর দূত (যিনি সাধারণ শাসন বা লেখাদি বহন করেন)। নিসৃষ্টার্থ দূত জরুরী কোন বিষয়ের কর্ত্তব্য স্থির করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃষ্ণকে একজন নিসৃষ্টার্থ দূত বলা যাইতে পারে; কারণ মহাভারতের যুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে তিনি পাণ্ডবদের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া কুরুসভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। দূতেরা তাহাদের নিজ সরকারকে সর্ব্বদা রাজসভার কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিতেন। তাহারা রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারীদের সহিত বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং দেশের যাবতীয় বিষয়ের সহিত পরিচিত

ছিলেন। পরিমিতার্থেরা বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা বিশেষ কোন কাজের জন্য বৈদেশিক সভায় প্রেরিত হইতেন। বাকী আর এক শ্রেণীর দূত ছিলেন, তাহারা শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সন্ধান লইতেন এবং গুপ্তচরদের কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন।

কোন রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে দূতকে সেই রাজ্যের রাজা হইতে অনুমতি লইতে হইত এবং আসিবার সময়ও অনুমতি লইয়া আসিতে হইত। নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও তিনি যথার্থভাবে দৌত্যকার্য্যের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেন। কেবল নিজ কার্য্য সম্পাদনে ব্যর্থ মনোরথ হইলে অথবা প্রাণহানির কোন আশঙ্কা থাকিলে বিনা আদেশে তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিতে পারিতেন। কৌটিল্যের মতে 'ছাড় পত্র' (pass port) দেখাইতে না পারিলে তাহাদের অতিমাত্রায় জরিমানা হইত। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণদিকে তাম্রশাসনদ্বারা ভূমি প্রভৃতি দান বা তাহা বিক্রয় করিবার সময়ে, অমাত্য শ্রেণীভুক্ত যে রাজপাদোপজীবী প্রতিগ্রহীতা বা ক্রয়কারী ব্যক্তির আবেদন রাজাদের নিকট অনুনয় সহকারে নিবেদন করিতেন—তাহাকে তাম্রশাসনের দূতক বলা হইত। "পাল শাসনযুগে সুদূর সুবর্ণ দ্বীপ (সুমাত্রা) ও যবদ্বীপ প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত রাজগণের সহিত ভারতের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের গৌড়াধিপগণের দূতযোগে নানাকার্য্যের সম্পাদন হইত। দেবপালের নালন্দা লিপি হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে শৈলেন্দ্র বংশতিলক যবভূমিপাল সমরাগ্রবীরের পুত্র, সুবর্ণ দ্বীপাধিপতি মহারাজ বলপুত্র-দেব

দূতকমুখে দেবপালের নিকট হইতে পাঁচটী গ্রাম তাম্রশাসনদ্বারা চাহিয়া লইয়া তাহা, নালন্দাতে তিনি যে বুদ্ধ ভট্টারকের বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে সর্ব্বপ্রকার পূজাদি বিধানের জন্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।" এইরূপে প্রাচীন ভারতে দূত বিভাগ যে কত বড় প্রয়োজনীয় বিভাগ ছিল তাহা অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র হইতে বেশ জানা যায়।

সামরিক বিভাগ

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।" অর্থাৎ যদি [সমরে] হত হও, স্বর্গ ভোগ করিবে; যদি জয়ী হও পৃথিবী ভোগ করিবে। গীতার এই মহাবচন হইতেই বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়দের নিকট যুদ্ধ কিরূপ মহৎ ব্রত ছিল।

প্রাচীনকালে যুদ্ধবিগ্রহ অনবরত হইত বলিয়া প্রত্যেক রাজ্যের বৃহৎ সৈন্যবিভাগ ছিল। শুনা যায় মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের ৬০০,০০০ পদাতিক, ৩০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৯০০০ হস্তী; অন্ধ্ররাজ্যের ১০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ অশ্বারোহী এবং ১,০০০ হস্তী; কলিঙ্গ রাজ্যের ৬০,০০০ পদাতিক, ১০,০০০ অশ্বারোহী

এবং ৭০০ হস্তী সৈন্য ছিল। হর্ষবর্দ্ধন যখন কনোজের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন সেই রাজ্যের ৫,০০০ হস্তী, ২,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। অতঃপর তিনি উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থান নিজ অধীনে আনয়ন করতঃ সৈন্য সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত সৈন্য-বল পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তী এই চারিটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহারই নাম চতুরঙ্গ সেনা। আক্রমণের অবস্থা ও সময়ের স্থবিধানুযায়ী এই সকল সৈন্যদল ব্যবহৃত হইত। মহাভারতে দেখা যায় যে ভাল আবহাওয়ায় রথ ও অশ্বারোহী সৈন্যেরা যুদ্ধে কুশলতার পরিচয় দিত, অন্যদিকে আবার পদাতিক সৈন্যেরা বর্ষার সময় ভাল যুদ্ধ করিতে পারিত। সাহসী লোক বাছিয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হইত। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধের সময় ভাড়া করিয়া পর্য্যন্ত বিদেশী সৈন্য আনা হইত। তৎকালের অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতগামিত্বের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। নানারকমের রথ যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। কখন কখনও শত্রুদের আক্রমণ হইতে সৈন্যদল রক্ষার নিমিত্ত উহা বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইত। বিপক্ষ সৈন্যদের স্থিতিস্থল আক্রমণ করিয়া বিশাল সৈন্যশ্রেণী ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে উহারা অদ্বিতীয় ছিল। শুনা যায়, কোন যুদ্ধে হস্তী ব্যবহৃত হইলে শত্রু পক্ষের আর ভয়ের সীমা থাকিত না। উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও কোন কোন ক্ষমতাশালী রাজার বিশাল নৌসৈন্য বিভাগ ছিল। মহাভারতের যুদ্ধে আমরা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর কথা শুনিতে

পাই। ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব, ১০৯৩৫০ পদাতি লইয়া এক অক্ষৌহিণী হয়। যোদ্ধা সৈন্য ছাড়াও যুদ্ধের উপকরণ ও মালপত্র পাঠাইবার জন্য অনেক লোক ও যানবাহন নিযুক্ত থাকিত। শুক্রনীতির মতে দেখা যায় সাহায্যকারী লোক সমেত সব চাইতে ছোট সৈন্য দলেও কমপক্ষে ৩০০ জন পদাতিক ৮০ জন অশ্বারোহী ১টি রথ, ২টি কামান, ১০টি উষ্ট্র, ২টি হস্তী, ২টি গাড়ী এবং ১৬টি ষাঁড় থাকিত। বিভিন্ন সৈন্যদলের বিভিন্ন রকমের পোষাক ও নিদর্শন (Badge) ছিল। তাহাদের অনেক রকমের শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ, জয়ঢাক ও রণদামামা প্রভৃতি বাদ্য ছিল। সঙ্কেত দ্বারাই সৈন্যদল পরিচালিত হইত। যুদ্ধের সময় গৃহপালিত কপোত দ্বারা এবং আরও অন্যান্য কৌশল অবলম্বনে সংবাদ সরবরাহ করা হইত। সৈন্যদের নিয়মিতভাবে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত এবং এমন কি শান্তির সময়েও সৈন্যদের প্রত্যহ কুচকাওয়াজ করিতে হইত। সময় সময় রাজা স্বয়ং সৈন্য দল পরিদর্শন করিতেন। রাজ্যের সৈন্যদের সামরিক বিভাগের সমস্ত নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হইত। তাহারা প্রকাশ্যে অস্ত্র বহন করিত এবং নায়কের আজ্ঞাধীনে থাকিত। কৌটিল্যের মতে প্রতি দশ জন সৈন্যের মধ্যে এক জন করিয়া পদিক (দলপতি) থাকিবে ; দশ জন পদিক এক জন সেনাপতির অধীনে থাকিবে ; এবং দশ জন সেনাপতি এক জন নায়কের অধীনে থাকিবে। কৌটিল্য নানারকম সৈন্যের বর্ণনা করিয়াছেন যথা—(১) মূল (পুরুষানুক্রমে যাহারা সৈন্যপদে নিযুক্ত আছে),

(২) ভাড়াটিয়া সৈন্য, (৩) শ্রেণী সৈন্য, (৪) বন্ধুর সৈন্য, (৫) অটবীবল (বন্যজাতি হইতে যে সৈন্য দল গঠিত হইয়াছে)। পূর্ব্বোক্ত চারিটি সৈন্য বিভাগ ছাড়াও যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রূষা ও সাহায্যের জন্য শ্রমিক সৈন্য Labour Corps ছিল। সৈন্যদের জন্য ডাক্তার ছিল। কৌটিল্যের লেখা হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিল। চিকিৎসকগণ তাহাদের আবশ্যকীয় অস্ত্রপাতি, মালিশ করিবার তৈল ও ব্যাণ্ডেজ এবং মহিলারা খাদ্য ও পানীয় হস্তে করিয়া পশ্চাৎ হইতে যোদ্ধাদিগকে উৎসাহিত করিত। এইরূপে দেখা যায় ইউরোপে Red-Cross Society প্রবর্ত্তিত হইবার অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পরিচর্য্যা-কারিণীরা আহত ও মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের দুঃখের লাঘব করিবার জন্য তাহাদের সেবা শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিত।

প্রধান সেনাপতি রাজ্যের সমস্ত সৈন্য বিভাগের কর্ত্তা। সমস্ত রকমের যুদ্ধকৌশল তাহার ভালরূপে জানা থাকিত এবং সৈন্য দলের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য ছিল। তাহার অধীনে চারিটি বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ থাকিত এবং তাহাদের অধীনে আবার বিভিন্ন দলের দলপতিরা থাকিত।

মেগাস্থেনিসের ভারত পরিদর্শনের সময় সমস্ত সৈন্য বিভাগের পরিচালনার ভার ত্রিশ জন লোক লইয়া গঠিত একটি কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল। তাহারা আবার প্রতি পাঁচ জন লইয়া ছয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটিতে বিভক্ত ছিল। তাহারা পূর্ব্বোক্ত চারিটি

সৈন্য বিভাগের এবং সৈন্যদের আহার্য্য সংগ্রাহক (commissariat) ও নৌবিভাগের তত্ত্বাবধান করিত।

তৎকালে যুদ্ধে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে আমরা তীর, ধনু, বর্ম্ম প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই। অগ্নিপুরাণে অস্ত্রকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

(১) যন্ত্রমুক্ত (যাহা মেশিন দ্বারা ছাড়া হয়)।

(২) পাণিমুক্ত (যাহা হাত দিয়া ছাড়া হয়)।

(৩) মুক্ত-সংধৃত (যাহা নিক্ষেপ করিয়া আবার সংগৃহীত হইত)।

(৪) অমুক্ত (যাহা নিক্ষেপ করা হইত না)।

(৫) বাহুযুদ্ধোপযোগী (হাতাহাতি যুদ্ধে যে অস্ত্র ব্যবহৃত হইত)।

'নীতিপ্রকাশিকায়' প্রাচীনকালের যুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি—ধনু, বাণ, শক্তি (বর্ষা), নালিকা, লগুড়, চক্র, কুঠার, দন্তকণ্টক প্রভৃতি মুক্ত অস্ত্র ছিল। বজ্র, তরবারি, পরশু, বল্লম, পিণাক, ত্রিশূল, মুগ্দর প্রভৃতি অমুক্ত অস্ত্র ছিল। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর অস্ত্র ছিল উহাদিগকে মন্ত্রমুক্ত বলিত (অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহা নিক্ষেপ করা হইত)। উহাদের ক্ষমতা এত ছিল যে কিছুতেই উহাদের ব্যর্থ করা যাইত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিষ্ণু চক্র, ব্রহ্মাস্ত্র,

বজ্রাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রমুক্ত অস্ত্রের নাম করা যাইতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য যোদ্ধারা লৌহ ও চামড়ার বর্ম্ম ব্যবহার করিত। যদিও বিদেশী কোন পর্য্যটকের লেখায় আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ নাই তথাপি রামায়ণ ও মহাভারতে বজ্র, নালিকা, আগ্নেয়াস্ত্র, বায়বীয় অস্ত্র, আগ্নেয় ঔষধ, অগ্নিচূর্ণ, শতঘ্নী ও সহস্রঘ্নী প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতে গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র ও বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

কুশলতার সহিত নানা রকমের সৈন্য ব্যূহ রচনা করিয়া তাহারা যুদ্ধে নিযুক্ত হইত। বীরগণপরিবেষ্টিত হইয়া সেনাপতি সকলের অগ্রে থাকিত। ব্যূহের ভিতর স্ত্রীলোক, ধনাগার, রাজা, সৈন্যদের নিরূপিত দৈনিক আহার ও তাহাদের রক্ষক থাকিত। ব্যূহের উভয়দিকে অশ্বারোহী, তাহার পর রথ এবং রথের পর পদাতিক সৈন্য থাকিত।

যুদ্ধে তাহারা ব্যোমযানও ব্যবহার করিত। ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল রামায়ণে এইরূপ উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ উহা ব্যোমযানের সাহায্যে হইবে। মহাভারতে কথিত আছে শল্যের সর্ব্বপুর নামে একটি লৌহনির্ম্মিত ব্যোমযান ছিল, ইহার সাহায্যে তিনি দ্বারকা আক্রমণ করিয়াছিলেন। উহা জল স্থল ও আকাশের মধ্য দিয়া বিচরণ করিত। ইহা ছাড়াও বসুরাজের একটি কাঁচের এবং কার্ত্তবীর্য্যের একটি সোণার বিমান ছিল। বিশ্বকর্ম্মালিখিত শিল্পসংহিতায় এইরূপ লেখা আছে যে

বিশ্বকর্ম্মা বায়ুর মত গতিবিশিষ্ট একটি যান (বিমান) নির্ম্মাণ করিযাছিলেন। উহা বাষ্পের দ্বারা চালিত হইত এবং আকাশে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারিত। নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত ও উজ্জ্বল এই বিমানটি পুষ্পক (Puspaka) রথ নামে ত্রিভুবনে পরিচিত।

এ স্থলে একটি কথা মনে রাখা যাইতে পারে যে জয়লাভের পরে রাজারা বিজিত দেশবাসীর প্রতি কেমন ব্যবহার করিবেন তাহাও প্রাচীন নীতিশাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বিষ্ণুসংহিতা জয়ী রাজাকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়াছেন—"শত্রুর রাজ্য জয় করিয়া তদ্দেশীয় প্রথার যেন উচ্ছেদ সাধন না করেন···রাজা শত্রুর রাজধানী জয় করিয়া তথায় তদ্দেশীয় রাজাকে রাজকীয় ক্ষমতা দিয়া রাজ্যশাসনে নিযুক্ত করিবেন···।" চাণক্য বলিয়াছেন —"···জয়ী রাজা রাজ্যজয়ের পর তথাকার সমস্ত গুণবান্ ব্যক্তিদের যোগ্যপদে নিযুক্ত করিবেন এবং বন্ধুহীন, অভাবগ্রস্ত, দুঃখীদের সাহায্য করিবেন এবং বন্দীদের মুক্তি দিবেন। রাজস্ব ও শাসন সংক্রান্ত অনিষ্টকর কোন আইন রদ করিয়া প্রকৃত আইনবিধি স্থাপন করিবেন।"

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ

বৈদিক যুগে রাজ্যের আয়তন ছোট থাকায় স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না, গ্রামের ছোটখাট কাজের বন্দোবস্ত গ্রামবাসীরা নিজেরাই করিয়া লইত। অতঃপর কালক্রমে রাজ্যের আয়তন বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহারা পৃথক্ বলিয়া গণ্য হইল এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় শাসনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নীতি স্থাপিত হইল। পূর্ব্বে গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজদিগকে শাসন করিত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা তখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনতা হইতে মুক্ত ছিল। গ্রামণী (গ্রামের নেতা) এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী স্থানীয় লোকদের দ্বারা মনোনীত হইত। মনুর সময়ে গ্রামের কর্ম্মচারীরা রাজকর্ম্মচারী হইয়াছিল এবং স্থানীয় শাসন প্রথা কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন হইয়াছিল। মৌর্য্যদের সময় গ্রাম সকল কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামবাসী, বিশ্বস্ত, দলপতি, গ্রাম্যবৃদ্ধ ও গুণশালী এমন কয়েকজন ব্যক্তি বাছিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ গ্রামের শাসন ও বিচারের জন্য নিযুক্ত করিতেন। স্থানীয় ভূমি-রাজস্ব হইতে সরকার তাহাদের বেতন দিতেন। তাহারা গ্রামের ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিতেন। অপরাধীদের শাস্তি বিধান করিতেন। তাহাদের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া ধার্য্য হইত। সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি ও মন্দির রক্ষা, দরিদ্র সেবা,

শিশুমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা তত্ত্বাবধান করিতেন। গ্রামের সীমানা লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে নিকটস্থ গ্রামের বৃদ্ধেরা মিলিয়া উহা মীমাংসা করিতেন। গ্রামপতিরা স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মধ্যস্থ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামবাসীরাও তাহাদের দলপতিকে কার্য্যক্ষেত্রে কায়িক ও আর্থিক সাহায্য করিত। গ্রামপতি ছাড়াও এক একটি গ্রামে পাঁচজন গ্রাম্য কর্ম্মচারী ছিল, যথা—পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, করনায়ক (যে জমির কর আদায় করে), কেরাণী, শুল্ক আদায়-কারী এবং প্রতীহার। গ্রামের আভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ের জন্য গ্রামপতি দায়ী ছিলেন। তিনি চোর ধরিতে না পারিলে তাহাকে অপহৃত ধনের ক্ষতি পূরণ দিতে হইত। গ্রামবাসীদের সহায়তায় তিনি গ্রামের সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি সাধনে যত্নপর হইতেন। যে সকল গ্রামবাসী গ্রামের উন্নতিসাধনে অগ্রণী হইত, তাহারা রাজসম্মান ও অর্থদ্বারা পুরস্কৃত হইত। কয়েকটি (পাঁচ হইতে দশটি) গ্রামের অধিপতির উপর একজন সার্কেল অফিসার (গোপ) থাকিতেন, তাহারা তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। কয়েকটি সার্কেল লইয়া একটি জেলা বা বিভাগ হইত, তথাকার শাসনকর্ত্তা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধীনে এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা আবার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আইনবিধি অনুসারে স্থানীয় শাসনপদ্ধতি চালিত হইত।

রাজধানী ও বড় বড় নগরীর জন্য স্বতন্ত্র শাসনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মেগাস্থেনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে রাজধানীর শাসন ত্রিশজন লইয়া গঠিত একটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হইত। উহা আবার প্রতি পাঁচজন সভ্য নিয়া ছয়টি কমিটিতে বিভক্ত ছিল। প্রথম কমিটির সভ্যেরা কুটীরশিল্প সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় কমিটি বিদেশী আগন্তুকদের কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিতেন। তৃতীয়টি দেশের জন্ম ও মৃত্যু হারের খোঁজ রাখিতেন। চতুর্থটি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহারা বাণিজ্য পরোয়াণা (trade licenses) মঞ্জুর করিতেন। দ্বিগুণ ট্যাক্স দিতে স্বীকৃত না হইলে কেহই একটির বেশী দুইটি ব্যবসায় করিতে পারিত না। পঞ্চমটি দেশজাত দ্রব্যের বিক্রয় সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতেন। নূতন জিনিষের সহিত পুরাতন জিনিষ বাজারে চালাইলে তাহারা ঐ সমস্ত দ্রব্যের মালিককে জরিমানা করিতেন। ষষ্ঠ কমিটি বিক্রীত দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করিতেন, দেশের মন্দির, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থান, বন্দর প্রভৃতির তত্ত্বাবধান ও বাজার দর নির্দ্ধারণ করিতেন এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষসাধন বিষয়ে যত্নবান্ ছিলেন।

রাজস্ব বিভাগ

অতি প্রথমে সর্ব্বসাধারণের স্বেচ্ছায় দেয় চাঁদা হইতে সম্ভবতঃ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু দেশে উন্নত ধরণের শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে সর্ব্বসাধারণ সরকারী রাজস্ব দিতে বাধ্য হইল। তৎকালে রাজস্ব প্রথা অত্যন্ত সাধারণ রকমের ছিল। কথিত আছে যে খৃষ্ট জন্মের চারি শতাব্দী পূর্ব্বে সরকারী রাজস্বের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রাজ্যের আয় বহু ক্ষেত্র হইতে হইত। প্রাচীনকালে রাজকর অত্যন্ত অল্প ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ যতই বাড়িয়া যাইতে লাগিল মানুষের উপর ততই করের বোঝা চাপিতে লাগিল। সেকালের আইন প্রণেতা গৌতম বলিয়াছেন—কৃষকেরা তাহাদের জমির উর্ব্বরতা অনুসারে কেহ উৎপন্ন দ্রব্যের দশম ভাগ, কেহ অষ্টম ভাগ, কেহ বা ষষ্ঠ ভাগ রাজাকে কর দিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে গবাদি ও স্বর্ণের উপর পঞ্চাশৎ ভাগ, বাণিজ্য দ্রব্যের উপর বিংশ ভাগ এবং পুষ্প, ফল, মূল, ঔষধীয় গাছ গাছড়া, মধু, মাংস, ঘাস ও জ্বালানি কাষ্ঠের উপর ষোড়শ ভাগ রাজকর ধার্য্য ছিল। পরবর্ত্তী কালে উহা আরও অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময় রাজস্ব কি প্রকারে আদায় হইত চাণক্যের উল্লিখিত বিস্তৃত বিবরণ হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। তাহার মতে দুই প্রকার উপায়ে রাজস্ব আদায় করা হইত। প্রথম উপায় অনুসারে

নিম্নোক্ত শাখা সমূহ হইতে রাজস্ব আদায় হইত, যথা—মূলধন, দেশের নানা ভাগ, খনি, বন-বিভাগ, গোচারণ-ভূমি, বাণিজ্য-পথ প্রভৃতি। রাজধানীতে নানারকমের কর ধার্য্য ছিল, যথা—তুলাজাত জিনিষ, তৈল, লবণ, মদ এবং ধাতব পদার্থ-জাত (Metallic manufactures) দেশীয় দ্রব্যের উপর মাশুল ধার্য্য ছিল: মালগুদাম, শিল্পী ও মন্দিরের উপর কর ধার্য্য ছিল; নগর দ্বারে কর আদায় করা হইত; পণ ও জুয়ার উপর জরিমানা আদায় করা হইত। কোন দ্রব্যের প্রকৃতি ও উৎপত্তি স্থল বিবেচনা করিয়া উহার উপর কর ধার্য্য হইত। মনু বলিয়াছেন—খরিদ দর ও বিক্রয় দর, পথের দূরত্ব, খোরাকী ও পাথেয় এবং পাঠাইবার খরচ ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া বণিকের উপর রাজার কর ধার্য্য করা উচিত। সুতরাং বিংশ হইতে দশম ভাগ পর্য্যন্ত কর ধার্য্য হইত। অনিষ্টকর দ্রব্যের উপর কর ছাড়াও জরিমানা আদায় করা হইত। কিন্তু মূল্যবান্ বীজ, বিবাহ ও পূজার সামগ্রী প্রভৃতি সমাজের কোন আবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর কোনরূপ কর আদায় করা হইত না। সরকারের অধীন প্রত্যেক জমির মালিক হইতে এবং খেয়াঘাট ও জলপথ প্রভৃতি হইতে কর আদায় করা হইত। এইরূপে খনি হইতে সরকার একটা মোটা রাজস্ব আদায় করিত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিত সেই সকল ব্রাহ্মণদের জমির জন্য কোন কর দিতে হইত না। ইহা ছাড়া শিশু, অন্ধ, স্ত্রীলোক ছাত্র, বোবা, বধির, রোগী প্রভৃতির নিকট হইতে কোনরূপ কর

আদায় করা হইত না। তবে আর্থিক দুর্গতি উপস্থিত হইলে শাসনকর্ত্তারা কিছু অতিরিক্ত কর আদায় করিত। মহাভারতে লিখিত আছে যে, রাজা এমন ভাবে কর ধার্য্য করিবেন যেন প্রজার উহা দিতে কষ্ট না হয় এবং তথায় রাজাদের আরও পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে লোভবশতঃ ও অন্যায়ভাবে ধনাগার পূর্ণ করিতে যেন তাহাদের বাসনা না হয়। কৌটিল্যের মতে রাজস্ব নিম্নলিখিত বিষয়ে খরচ হওয়া উচিত, যথা—যাগযজ্ঞ, পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ, দান, সরকারী প্রাসাদ সমূহের সংস্কারাদি, বিদেশী প্রচারকদের ক্রিয়াকলাপ, সৈন্যের রক্ষণাদি ও সেনা পাঠাইবার কাজ, সর্ব্বসাধারণের কাজ, বন-বিভাগ। শুক্রনীতির মতে রাজস্বের অর্দ্ধেক শাসনবিভাগের নিম্নোক্ত ছয়টি কার্য্যে ব্যয়িত হইত, যথা—প্রধান কর্ম্মচারীদের বেতন—দ্বাদশ ভাগ, সৈন্য—চতুর্থ ভাগ, দান—চতুর্বিংশ ভাগ, সর্ব্বসাধারণের আবশ্যকীয় কোন খরচ—চতুর্বিংশ ভাগ, কর্ম্মচারীদের বেতন—চতুর্বিংশ ভাগ, রাজার ব্যক্তিগত ও রাজপরিবারের খরচ—চতুর্বিংশ ভাগ। শুক্রনীতির মতে বিশ বৎসরের সরকারী খরচ যাহাতে চলিতে পারে তজ্জন্য ধনাগারে যথেষ্ট অর্থ জমা থাকিত। সেইজন্য কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবাধ্যক্ষকে এরূপভাবে রাজ্যের আয়, ব্যয় ও বরাদ্দ নির্দ্ধারিত করিতে হইত যেন সরকারী বেসরকারী সমস্ত খরচ পত্র বাদ দিয়াও সরকারী তহবিলে প্রতি বৎসর বহু অর্থ জমা থাকে। এইজন্য তাহাদিগকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইত।

সরকারী আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য একজন হিসাব তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাহার অধীনে আবার কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তি কাজ করিত। তাহাদের মধ্যে কেহ টাকা গণিত, কেহ যোগ দিত, কেহ বা মুদ্রা পরীক্ষা করিত। হিসাব-তত্ত্বাবধায়ককে হিসাবের খাতাপত্র ভালভাবে রক্ষা করিতে হইত এবং রাজস্বের কোন অংশ যেন অতিরিক্ত বাজে খরচ না হয় তজ্জন্য তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। তিনি তাহার অধীন ব্যক্তিদের নিকট হইতে হিসাব বুঝিয়া লইতেন এবং উহা পরীক্ষা করিতেন। একজন খনির তত্ত্বাবধায়কও থাকিতেন। তিনি দেশের খনিজ দ্রব্যের খোঁজ রাখিতেন এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রণয়ন ধাতুর মূল্য নিরূপণ করিতেন। এইরূপে কোষাগার, টাকশাল ব্যবসায় বাণিজ্য, জঙ্গল, অস্ত্রাগার, তুলা ও ওজন (weight and measure), কুদ-ঘর (Toll-house), নৌবহর, কৃষিকার্য্য, বয়ন, রথ, আবগারী বিভাগ ও বধ্যভূমি (Slaughter-house) প্রভৃতি বিষয়ের জন্য বিভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত ছিলেন। কৌটিল্য তাহার অর্থ শাস্ত্রে সমাজ-তন্ত্রনীতির উপর রাষ্ট্রের অধিকার কায়েমী করিতে যাইয়া নিম্নোক্ত ষ্টেটের অধ্যক্ষের যে দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন তাহা বাস্তবিক লক্ষ্য করিবার বিষয়— রাষ্ট্রপালনে পণ্যাধ্যক্ষ (Superintendent of commerce), কুপ্যাধ্যক্ষ (Superintendent of forest produce)শুল্কাধ্যক্ষ (Superintendent of tolls), সূত্রাধ্যক্ষ (Superintendent of weaving), সীতাধ্যক্ষ (Superintendent of Agicul-

ture), সুরাধ্যক্ষ (Superintendent of liquor), নাবধ্যক্ষ (Superintendent of ships), অশ্বাধ্যক্ষ (Superintendent of horses), গোহধ্যক্ষ (Superintendent of cows), হস্ত্যধ্যক্ষ (Superintendent of elephants), মুদ্রাধ্যক্ষ (Superintendent of passports), সূনাধ্যক্ষ (Superintendent of slaughter-house), গণিকাধ্যক্ষ (Superintendent of prostitutes).

ধনোৎপাদনের বৃহৎ উপায়গুলি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া যাহাতে উৎপাদিত ধন সমগ্র সমাজের স্বার্থে ব্যয়িত হয় তজ্জন্য কৌটিল্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার মতে পণ্যাধ্যক্ষ বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা, মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি নিরূপণ করিবেন ; পণ্যাদির বিক্ষেপের (distribution) ও সংক্ষেপের (centralisation) এবং ক্রয় বিক্রয়াদির উপযোগী সময় নির্দ্ধারণ করিবেন যে সমস্ত পণ্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত উহাদের একীকৃত করিয়া মূল্য স্থির করিবেন এবং রাজার স্বভূমিজ পণ্য (local merchandise of the crown) একত্র করিয়া ও পরভূমিজ পণ্য (imported merchandise) বিক্ষেপ করিয়া যাহাতে প্রজাদের নিকট সুবিধা দরে বিক্রয় করা হয় এবং প্রজাদের ক্ষতি করিয়া বিশেষ লাভ না লওয়া হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের অনুজ্ঞা-পত্র (license) ছাড়া কেহ কোন ব্যবসায় করিতে পারিত না, যদি ষ্টেটের অনুজ্ঞাত ব্যবসায়ী ব্যতীত অপর কেহ নিজ প্রয়োজনের বেশী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত

তবে তাহার দ্রব্যাদি ষ্টেট লইয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ বণিক-দিগের লাভের হার রাষ্ট্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, স্বভূমিজের উৎপাদন-ব্যয়ের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হার এবং পরভূমিজের ক্রয়-মূল্যের উপর শতকরা দশ টাকা হারের অধিক কেহ লাভ করিতে পারিত না; যে ব্যক্তি অধিক লাভ করিত তাহাকে জরিমানা দিতে হইত। তৃতীয়তঃ উপরোক্ত নিয়মগুলি যাহাতে কেহ লঙ্ঘন না করে তজ্জন্য নির্দ্ধারিত বাজার ব্যতীত অন্য কোথাও জিনিষ পত্র বিক্রয় করিতে দেওয়া হইত না; এমন কি জিনিষের উৎপত্তি-স্থলেও বিক্রয় একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। চতুর্থতঃ বণিক্‌গণ যাহাতে একত্র হইয়া ইচ্ছামত মূল্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাদের এই উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত সমিতিকে শাস্তি দেওয়া হইত। পঞ্চমতঃ পণ্য বাহুল্য (over supply) হইলে ঐ পণ্য একস্থানে বিক্রয় করিবার এবং যে পর্য্যন্ত ঐ স্থানের মাল শেষ না হইত সে পর্য্যন্ত সেই পণ্য অন্যত্র বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবার ক্ষমতা পণ্যাধ্যক্ষের ছিল। অন্তর্বাণিজ্য ছাড়া বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধেও রাষ্ট্রের দায়িত্ব কম ছিল না। বহির্বাণিজ্য যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেশের সুখ সম্পদ্ বর্দ্ধিত করিতে পারে তজ্জন্য পণ্যাধ্যক্ষকে বিদেশী বাণিজ্য-প্রধান সহর সমূহের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইত; বাণিজ্য করিতে যানবাহনের ও পথে খোরাকী খরচ কত হইবে এবং পথে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিলে কিভাবে তাহার প্রতিকার করিতে হইবে প্রভৃতি সম্বন্ধে খোঁজ রাখিতে হইত; স্বদেশী

পণ্যের মূল্যের বিনিময়ে যে বিদেশী পণ্য পাওয়া যাইত তাহার মূল্য তুলনা করিয়া এবং বিদেশী রাষ্ট্রকে শুল্ক (toll), বর্ত্তনী (road-cess), আতিবাহিক (conveyance-cess), গুল্মদেয় (tax payable at military station), তরদেয় (ferry charges) ও ভাগ (portion of merchandise payable to the foreign kings) ইত্যাদি ব্যয়ের পর সর্ব্বশুদ্ধ কোন লাভ হইবে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইত। উপরন্তু বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহারা সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত রাষ্ট্র হইতে তাহারা অনেক সুবিধা ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইত।

দেশের কৃষি সম্বন্ধেও রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কৃষক সম্প্রদায় যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত থাকে অর্থাৎ যাহাতে এক গ্রামে কৃষকগণের বাহুল্য ও অন্য গ্রামে অভাবহেতু তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনে অসাম্য না হয় তজ্জন্য ষ্টেটের emigration ও immigrationএর উপর লক্ষ্য ছিল। রাষ্ট্র কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কৃষকদিগকে এক পুরুষের জন্য বর্ত্তমান Takavi Loanএর ন্যায় অর্থ, শস্য ও গবাদি দ্বারা সাহায্য করিত; কিন্তু কোন কৃষক কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিলে হয় রাষ্ট্র যথাবিধি তাহার শাস্তি বিধান করিত অথবা তাহার জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া অন্য কাহাকেও দিত। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কৃষিতন্ত্রগুল্মবৃক্ষায়ুর্ব্বেদজ্ঞ (possessed of the knowledge of the science of agriculture dealing with the plantation of bushes and trees) সীতাধ্যক্ষ ও অন্যান্য

এরূপ লোকদ্বারা পরিচালিত কৃষি-বিভাগ ছিল এবং রাষ্ট্রকে একটি আবহতত্ত্ব-বিভাগ (Meteorological Department) ও কর্ম্মবহুল একটি সেচ-বিভাগও (Irrigation Department) পুষিতে হইত। কোন্ ঋতুতে কোন্ বীজবপন করিতে হইবে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও পূর্ব্বাভাষ ইত্যাদি রাষ্ট্র কৃষকদিগকে জানাইয়া দিত। উপযুক্ত গোচারণ-ভূমি নির্দ্দেশ করিতে ও উৎকৃষ্ট গবাদি জননের (cattle-breeding) উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অত্যন্ত যত্নপর ছিল। অধিকন্তু কৃষিবিভাগের সহিত গো-শালাও (dairy farming) যুক্ত ছিল।

উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও শ্রেণী (guilds), শ্রম (labour), ও বেতন (wages) সম্বন্ধে রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা ছিল। শ্রেণী-সমূহ যাহাতে ঐ বিধি ভঙ্গ করিতে না পারে এবং উহাদের উপর যাহাতে রাষ্ট্রের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য কৌটিল্য তিনজন কমিশনার অথবা তিনজন মন্ত্রীদ্বারা গঠিত একটী বোর্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বোর্ড শ্রেণীর গঠন ও কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং বেতন, কার্য্যকাল ও জরিমানা সম্বন্ধীয় যাবতীয় আইন-বিধি প্রস্তুত করিত। ইহা ছাড়া ডাক্তার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতির সমস্ত ব্যবসায়িগণ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ ছিল। নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে রাষ্ট্র হইতে তাহাদের কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। দেশের আমোদ-প্রমোদাদিও রাষ্ট্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং উহাদের আয়ের পঞ্চদশ ভাগ amusement tax স্বরূপ ধার্য্য

ছিল। দ্যূত-ক্রীড়াদি অধ্যক্ষের দ্বারা নিরূপিত স্থান ব্যতিরেকে হইতে পারিত না ও উহাদের আয়ের শতকরা পাঁচ টাকা gambling tax স্বরূপ ধার্য্য ছিল। এমন কি গণিকাগমনের উপরেও রাষ্ট্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। গণিকাগণের গণিকাধ্যক্ষকে (superintendent of prostitutes) তাহাদের দৈনিক ভোগ (fees) ও যে সকল পুরুষ তথায় গমন করিত তাহাদের নামধামাদি জানাইতে হইত এবং তাহাদের আয়ের শতকরা পঞ্চদশ ভাগ রাষ্ট্র গ্রহণ করিত। প্রাচীন ভারতে সমাজ-তন্ত্রনীতির উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকার থাকায় রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল যে কতখানি সাধিত হইয়াছিল কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্রের' উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলি পাঠেই তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

বিভিন্ন কর্ম্মচারীরা তাহাদের কর্ম্মের জন্য যে বেতন পাইত চাণক্য-প্রদত্ত নিম্নোক্ত তালিকা হইতে তাহা বেশ জানা যায়। প্রধান পুরোহিত, রাজকীয় শিক্ষক, প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, যুবরাজ (crown-prince), রাণীমাতা (queen-mother), রাণী (The queen-consort), প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ৪৮,০০০ ; নগর ও রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ, পুলিশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, কালেক্টার জেনারেল, কোষাধ্যক্ষ প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ২৪,০০০ ; রাজকুমার, রাজকুমারদের মাতা, (Mother of princes), নগরের প্রধান কর্ম্মচারী, বিচারক, প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি '(The heads of the

departments), কাউন্সিলের সভ্য, প্রধান প্রান্তপাল (The chief officers of boundaries), পুলিশের অধ্যক্ষ প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ১২,০০০ ; কর্পোরেসনের নেতা, অশ্ব ও হস্তীর অধ্যক্ষ এবং তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীবৃন্দের (inspecting officers) প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ৮,০০০ ; পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও বন বিভাগের অধ্যক্ষ প্রত্যেকের প্রতি বৎসর ৪,০০০ পণ (সম্ভবতঃ তৎকালীন রৌপ্য মুদ্রা) বেতন স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। মুদ্রা ও শস্যের দ্বারা বেতন দেওয়া হইত, অথবা অর্দ্ধেক মুদ্রা ও অবশিষ্ট অর্দ্ধেক শস্যের দ্বারা দেওয়া হইত। কোন কোন সময় ষ্টেটের কর্ম্মচারীবৃন্দের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সরকার পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে জমি দান করিতেন। দীর্ঘকাল কাজ করিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পরও সরকারী কর্ম্মচারীরা পেন্‌সন্ ভোগ করিতেন, এমন কি উপার্জ্জনশীল কোন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পরিবার সরকার হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ প্রাপ্ত হইত।

উপরি আলোচিত বিষয়গুলি ছাড়াও তৎকালে রাজন্যবর্গের যত্নে, উৎসাহে, অর্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি যে কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল ভবিষ্যতে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমাপ্ত